বেঙ্গল টাইমস

শারদ সংখ্যা ২০২৩

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

সম্পাদকীয়

আট বছর পর

ঠিক আট বছর আগের কথা। পুজোর তিন–চার দিন আগে হঠাৎ এল প্রস্তাবটা। একটা অনলাইন পুজো সংখ্যা করলে কেমন হয়। সেই রাতেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, একবার ঝুঁকি নিয়েই দেখা যাক। প্রস্তুতি না থাকুক, পাগলামিটা ছিল পুরোদমে। মনে আছে, মাত্র তিনদিনের মাথায় সোয়া একশো পাতার একটা শারদ সংকলন বেরিয়েছিল। একটার পর একটা মেল যাচ্ছে। দিন–রাত এক করে একের পর এক পাতা তৈরি করে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিল বন্ধুবর শুভজিৎ বোস। রাত বারোটায় হয়েছিল আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। কীভাবে মাত্র তিনদিনে পুজো সংখ্যা রাতের আলো দেখেছিল, সে কথা ভাবলে এখনও কেমন রোমাঞ্চ জাগে।

তখনও নিউজ পোর্টাল জিনিসটা ব্যাঙের ছাতার মতো এখানে সেখানে গজিয়ে ওঠেনি। কর্পোরেট সংস্থাগুলিও হামলে পড়েনি। তখনও ডিজিটাল মিডিয়া ‘বঙ্গ জীবনের অঙ্গ’ হয়ে ওঠেনি। বাংলায় তখন হাতে গোনা কয়েকটি নিউজ পোর্টাল। তাদের মধ্যে একেবারে সামনের সারিতেই ছিল বেঙ্গল টাইমস। প্রতিদিন একের পর এক ঝাঁঝাঁলো লেখা, আকর্ষণীয় ফিচার। পাঠক মহলে খুব দ্রুতই সাড়া ফেলেছিল সেই নবাগত ওয়েবসাইট।

এই আট বছরে কতকিছু বদলে গেল। কত পোর্টাল, কত ইউটিউব চ্যানেল গজিয়ে উঠল। কত ভুয়ো খবরের ছড়াছড়ি। কত পোর্টাল সাড়া জাগিয়েও অকালে হারিয়ে গেল। কত নতুন নতুন ভাবনা। কত নতুন নতুন ছেলেমেয়ে কাজ করছে এই ভার্চুয়াল মিডিয়ায়। শুধু লেখা নয়, প্রায় সব সাইটই ভিডিও আপলোড করছে। ফেসবুক লাইভ করছে। প্রযুক্তিকে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন চটজলদি ফাস্ট ফুডের আবহে সাবেকি বেঙ্গল টাইমস তো পিছিয়ে পড়বেই। না রয়েছে কর্পোরেট আনুকূল্য, না রয়েছে যথার্থ টিম, না রয়েছে ঢাক পেটানোর

প্রযুক্তিকে দারুণভাবে ব্যবহার করার মুন্সিয়ানা।

অগত্যা, বেঙ্গল টাইমসের চরিত্রেও কিছু বদল এসেছে। দৈনন্দিন খবরের বদলে বিশ্লেষণ, ফিচারে জোর দেওয়া হয়েছে। রসগোল্লার বদলে সন্দেশ-বরফিতে জোর। যেন তিন-চারদিন পরেও টাটকা মনে হয়। অনিয়মিত হয়েছে, হোঁচট খেয়েছে। ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে এসেছে ই-ম্যাগাজিন। গত দেড় বছরে প্রায় দু' ডজন ই-ম্যাগাজিন দিনের আলো দেখল। সবগুলো যে দারুণ সাড়া ফেলেছে, এমন নয়। তবে বেশ কয়েকটা সংখ্যা বেশ ভাল সাড়া পেয়েছে, পাঠকদের নির্ভেজাল প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝতে পারি।

এবার শারদ সংকলন। কিছুটা বিলম্বিত। তবে সেই বিলম্বটা কিছুটা ইচ্ছাকৃত। অন্যরা জুলাইয়ে বের করে দিল বলে আমাদের জুন মাসে বের করে দিতে হবে, এমন ছেলেমানুষির প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকাই ভাল। গায়ে পুজোর গন্ধ না থাকলে কীসের পুজো সংখ্যা! প্রস্তুতি ছিল। আবার শেষবেলার তাড়াহুড়োও ছিল। চাইলে কলেবর আরও বাড়ানোই যেত। কিন্তু বেশি বড় হলে আপলোড করা, শেয়ার করা, ই মেলে অ্যাটাচ করা-এসব যান্ত্রিক সমস্যা থাকে। পরিসর একটু কম হলে প্রযুক্তিগত সেই সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যায়। তাই সেঞ্চুরির আগেই থেমে যাওয়া। তাছাড়া, একগুচ্ছ লেখা জুড়ে দিয়ে পাঠককে বেশি বিড়ম্বনায় না ফেলাই ভাল।

পড়ে ফেলুন। পুজোর পর বেঙ্গল টাইমসকে আরও ঝকঝকে চেহারায়, আরও নতুন আঙ্গিকে হাজির করার প্রতিশ্রুতি রইল। সেইসঙ্গে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ই-ম্যাগাজিনের চেষ্টাও জারি থাকবে।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক
বেঙ্গল টাইমস

শ্রদ্ধায়
স্মরণে

কর্মাটাঁড়ের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার

শাক্য সেন

মংপুতে তিনবার গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। থাকতেন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। বাড়িতে না বলে কোয়ার্টারে বলাই ভাল। মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী চাকরি করতেন কুইনাইন ফ্যাক্টরিতে। তাঁর বাংলোতেই অতিথি হয়ে উঠতেন বিশ্বকবি। তখন জীবনের প্রান্তবেলা। ঘুরে বেড়ানোর তেমন সামর্থ্য নেই। পাহাড়ি সেই জনপদে বাঙালি প্রায় ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশই নেপালি। ফলে, রবীন্দ্রনাথ কী লেখেন, সেসব বোঝা তাঁদের কম্ম নয়। তবু সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড় লেগে যেত। আসলে, কবির কাছে নয়, তাঁরা আসতেন ডাক্তারের কাছে। এখানে রবি ঠাকুরের পরিচিতি ছিল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে। তিনি এই পাহাড়ি মানুষদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, ওষুধ দিতেন।

বিশ্বকবির সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী বিদ্যাসাগরের এই ব্যাপারটায় খুব মিল। তিনিও শেষ জীবনে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারই হয়ে উঠেছিলেন। সেটাও কলকাতা থেকে অনেক দূরে, কর্মাটাঁড়ে। সেই কর্মাটাঁড় দীর্ঘদিন ছিল বিহারে। রাজ্য ভাগের পর তা এখন ঝাড়খণ্ডে। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সতেরোটা বছর কেটেছে এই আদিবাসী অধ্যুসিত গ্রামে। আর এখানে তিনি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করতেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়। কিংবদন্তি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক হিসেবেও খ্যাত) বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিদ্যাসাগরও সরকার মশাইকে নানা সেবামূলক কাজে টাকা তুলে দিতেন।

সেইসঙ্গে বিদেশি বই পড়ে টুকটাক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও আয়ত্ব করেছিলেন। যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছিল সেই কর্মাটাঁড়ে।

হঠাৎ কর্মাটাঁড়ে গেলেনই বা কেন? বলা যায়, নিজের গ্রাম আর কলকাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। বিদ্যাসাগর বলতেই উঠে আসে তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের কথা। কিন্তু ঘটনা হল, এই বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন ইশ্বরচন্দ্র। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই গ্রামে আর কখনও ফিরবেন না। সেই প্রতিজ্ঞার পরেও তিনি আরও ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর কখনই নিজের গ্রামে পা রাখেননি। কলকাতা সম্পর্কেও একইরকম বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যেভাবে কটাক্ষ, বিদ্রুপ ও পদে পদে বাধা পেয়েছেন, তা তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। অনেকেই জানেন, বিদ্যাসাগর নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গেও একসময় সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭২ সাল নাগাদ ছেলেকে তাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। স্ত্রীও মারা গেলেন। অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় কিছুতেই আর মন টিকছিল না। এদিকে, গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন। ঠিক করলেন, বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে একেবারে কোনও প্রান্তিক গ্রামে গিয়ে থাকবেন।

প্রথমে ঠিক ছিল, তিনি দেওঘরে থাকবেন। একটি বাড়িও দেখেছিলেন। প্রাথমিকভাবে পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু বাড়িওয়ালা এমন দাম হাঁকলেন, তিনি পিছিয়ে গেলেন। শেষমেষ বেছে নিলেন দেওঘর থেকে কিছুটা দূরে, কর্মাটাঁড়। আদিবাসী ভাষায় টাঁড় মানে, উঁচু জমি, যেখানে জল দাঁড়ায় না। আর কর্মা নামে এক মাঝি ছিলেন। মোদ্দা কথা, কর্মা মাঝির উঁচু জমি। সেখানে এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে

১৪ বিঘা জমি কিনেছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি সেই জমি বিক্রি করে দেন। কিনে নিলেন বিদ্যাসাগর। তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল ৫০০ টাকা। সেই জমিতে নিজে একটি বাড়ি তৈরি করলেন। নাম দিলেন নন্দনকানন। একটি শোবার ঘর, একটি পড়াশোনার ঘর। আরেকটি বড় হল ঘর। সেখানে রাতে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাতেন।

কর্মাটাঁড়ে এসেই বিদ্যাসাগর বুঝলেন, এত বড় এলাকায় কোনও ডাক্তার নেই। এখানে লেখাপড়া শেখানোর চেয়েও চিকিৎসা বেশি জরুরি। তাই সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ডাক্তারখানা। মোটামুটি সকাল দশটা পর্যন্ত চলত এই পর্ব। ভিজিট নেওয়া তো দূরের কথা। ওষুধও নিজেই বানিয়ে দিতেন। সেই সঙ্গে কোনও কোনও রোগীর পথ্যও তৈরি করে দিতে হত। সাগু, বাতাসা, মিছরি নিয়েই বসতে হত। এখানেই ডাক্তারি শেষ নয়। বিকেল দিকে বাড়ি বাড়ি গিয়েও চলত ডাক্তারি। আর সন্ধের পর গ্রামের বয়স্কদের নিয়ে স্কুল। এভাবেই দিন কেটে যেত। এই আদিবাসীদের সান্নিধ্য বেশ ভালই লাগত বিদ্যাসাগরের। এ নিছক কয়েক মাসের সমাজসেবা নয়। শেষ জীবনের সতেরোটা বছর এভাবেই কেটেছে। ভাবা যায়, বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ কিনা শেষ সতেরোটা বছর (১৮৭৩—১৮৯০) কাটিয়ে ছিলেন একেবারে আদিবাসীদের গ্রামে!

মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন ঠিকই। সেটা মূলত চিকিৎসার কাজে। তাও অল্প দিনের জন্য। ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতেন ওষুধ, ফল, জামাকাপড়। বিদ্যাসাগর কর্মাটাঁড়ে ফিরলেন মানেই গ্রামর মানুষের প্রত্যাশার শেষ নেই, ‘এই বিদ্যেসাগর, কী এনেছিস?’ পুজোর আগে গ্রামের প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যেতেন। কারও জন্য শাড়ি, কারও জন্য লুঙ্গি, কারও জন্য জামা। শেষ একটা বছর অবশ্য খুবই অসুস্থ ছিলেন। ফিরে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। সেখানেই মৃত্যু (১৮৯১)। যে পুত্রকে তাজ্যপুত্র করেছিলেন, সেই নায়াণচন্দ্র এবার

কর্মাটাঁড়ে এলেন সম্পত্তির দখল নিতে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, সম্পত্তি বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সেটাই তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন। বিক্রি করলেন কলকাতার মল্লিক পরিবারকে। সেই পরিবারও জায়গাটা নিয়ে ফেলেই রাখল।

অনেক পরে এগিয়ে এল বিহার বাঙালি সমিতি। স্বাধীনতার আগেই তাঁরা মল্লিক পরিবারের কাছ থেকে সেই জমি ও বাড়ি কিনে নিলেন। চালু করলেন একটি মেয়েদের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৯৭৮ সাল নাগাদ মূলত তাঁদের দাবিতেই কর্মাটাঁড় স্টেশনের নাম হয়ে গেল বিদ্যাসাগর। গত বছর ঝাড়খণ্ড সরকার ঘোষণা করেছে পুরো কর্মাটাঁড় থানা ও ব্লকও বিদ্যাসাগরের নামে হয়ে যাবে। সেই বাড়ি, সেই স্কুল আজও আছে। আজও আছে বিদ্যাসাগরের লাগানো সেই আমগাছ। পাশে তৈরি হয়েছে গেস্ট হাউস।

ইতিহাস বিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালির বিশেষ একটা 'সুনাম' আছে। ইতিহাস তাঁর ভেতর রোমাঞ্চ আনে না। তাঁকে শিহরিত করে না। তাই বছরভর বাঙালি এত এত জায়গায় বেড়াতে যায়, তাঁদের কজনই বা আসেন এই কর্মাটাঁড়ে! আপনার পরিচিত একশো জনের মধ্যে খোঁজ নিন। দেখুন, একজনও সেখানে যাননি। একশো জনের মধ্যে অন্তত আঠানব্বই জন 'কর্মাটাঁড়' নামটাই শোনেননি।

যেখানে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সতেরোটা বছর কাটিয়েছিলেন, সেখানে বাঙালি একদিনের জন্যও যেতে পারে না! ২০০ বছরের জন্মদিনে আমরা ফেসবুকে ছবির বন্যা বইয়ে দিই। কিন্তু একটা ছুটির দিন দেখে একটু কর্মাটাঁড় ঘুরে আসা যায় না!

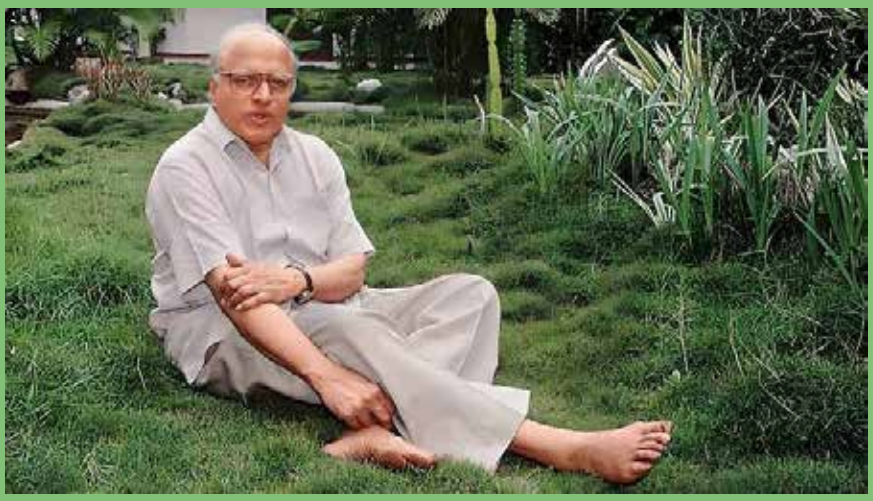

বছরে দু’বার নবান্নের দিশারী

ড. অরিন্দম অধিকারী

চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে,
হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রুপশালি-ধানভানা রুপসীর।

জীবনানন্দ দাশ।

শালি ধানের চিঁড়ে, বিন্নি ধানের খই, মৌল ধানের মুড়ি, কণকচূড়ের মোয়া, গোবিন্দভোগের পায়েস চোখের সকল ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়, কবির কবিতার পংক্তি আবৃত্তিকারের ঠোঁটে মিষ্টতা এনে দেয় ঠিকই, কিন্তু পেট ভরে দু’বেলা খাবারের অনাবিল আনন্দ কোথায়?

হেমন্তের মিঠেল ধূপছায়া মেখে চন্দনি গাঁয়ে

কবিরাজশাল টিয়া সবুজ থেকে সোনালি হত। নবান্ন হয়ে পৌষের কোন এক হীম পড়া সংক্রান্তির রাত পর্যন্ত চালের গুঁড়ি নিয়ে আনন্দের আরাধনা। তারপর হিমেল হাওয়ার শুকনো টান ফাগুন মাসেও আট থেকে আশির ঠোঁট জুড়ে আরও দীর্ঘায়িত হত। পল্লি বাংলার ভাতের হাঁড়িতে মাকড়শা তার জাল বুনত। মাঘের সূর্য যখন উত্তরায়ণে পাড়ি দিত আর জমিদার সঞ্জয় সেনের চন্দনি গাঁয়ে হাভাতে মানুষেরা দুইবেলা অন্ন জোটাতে হিমশিম খেত। চন্দনি গাঁয়ের অঞ্জনা নদীতে বৈশাখ মাসে হাঁটু জল থাকত। আবারও অপেক্ষা। আষাঢ়ের কালো বরণ মেঘ কাঁদলে তবে আউশ ফলবে। আসলে চন্দনি গাঁয়ের কুঞ্জদের জীবনে শুধু একতারার মৃদু সুর ছিল। কিন্তু পেট ভরে ভাত খাওয়ার অর্কেস্ট্রার ঝংকারের মত জীবনালেখ্য ছিল না।

উপরওয়ালার উপর ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে উদরের জ্বালা নিয়ে আধাপেট খেয়ে রাতের তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়া।

‘মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি’ ভুখা মানুষের জীবনে রূপালি রেখা এঁকে দিল কৃষি বিজ্ঞানের এক একটা যুগান্তকারী গবেষণা। রোগাক্রান্ত, কম উৎপাদনকারী ফসলের সঙ্গে লড়তে থাকা চাষির মুখে হাসি ফোটাতে রোগ প্রতিরোধকারী ধান ও গমের জাত (স্ট্রেন) হয়ে উঠল বিশল্যকরণী। যে কোনও জলবায়ু ভিত্তিক পরিবেশে ফসলের অধিক উৎপাদনই ছিল কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। উৎপাদনের প্রাণভোমরা জিনের পরিব্যাক্তি সাধন করেই ভারতের এক বিলিয়ন মানুষের মহামারী রুখে দিয়েছিল সেদিনের কৃষি বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তামিলনাড়ুর তাঞ্জাবুরের কুম্ভকোণম শহরে জন্মগ্রহণ করা ভারতবিখ্যাত

কৃষি বিজ্ঞানী মানকম্বু সাম্বাসিবন স্বামীনাথন। যিনি এম এস স্বামীনাথন নামে পরিচিত। কৃষি বিজ্ঞান যে এক গণ আন্দোলনের জন্ম দেয় ও তা জনসমর্থিত হয়ে এক বিপ্লবের রূপ নেয়, তা ভারত আগে দেখেনি। এ যেন কিষাণ কিষাণীর ক্ষেতে সুলুকসন্ধান। চাষির লাল রক্ত জল করা সবুজ বিপ্লব। ১৯৬০ এর দশকে দুর্ভিক্ষ রুখে দেওয়ার কিংবদন্তি নায়ক এম এস স্বামীনাথন। মেধা শুধু বীক্ষণাগারে আবদ্ধ ছিল না। মেধা সৌরভ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল চাষের সোঁদা মাটির গন্ধে। ভারতের মতো অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার দেশে পরিবেশগত সমস্ত ধরণের ঝুঁকিকে স্বীকার করেই স্বামীনাথনরা কৃষিতে সবুজ বিপ্লব এনেছিলেন।

এটা ছিল সেই সময়ের চাহিদা। যা আজকের দিনে বিতর্কের ভাল-মন্দের সুতিকাগারে অবলীলায় কাঁটা ছেঁড়া করা যায়। সমস্ত রকম জৈব ও অজৈব পীড়নকে ছাপিয়ে রোগ ও কীটমুক্ত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানে গোলা উপচে পড়ুক এটাই চেয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্বামীনাথন। নব নব ফর্মুলেশনের রাসায়নিক মৌল যুক্ত ছত্রাকনাশক, কীটনাশক আবিষ্কারের নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন স্বামীনাথনরা। উচ্চ ফলনশীল জাত যে রাসায়নিক সার ছাড়া উচ্চফলনশীল হবে না তা কৃষক হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। তাই রাসায়নিক সার ব্যবহার কৃষকের কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সেচসেবিত এলাকা বৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ একলাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। IR8 চাল ভারতকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেছিল। সব রকমের বৈজ্ঞানিক কাঠামোর সফল রূপকার ছিলেন এম এস স্বামীনাথনরা। পাঞ্জাবে এর সফল রূপায়ণ হয়েছিল। কৃষকের আয় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভূমিক্ষয়, জলদূষণ, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়া, কারসিনোজেনিক রোগের বৃদ্ধি-সহ সমস্ত তার্কিক প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়েই সবুজ বিপ্লবের সব সুফলের সুবিধাভোগী হয়েছি আমরা। তাই সবুজ বিপ্লব মানেই পাঞ্জাবের ঘটনা, এটা বড্ড সরলীকরণ। আমাদের উঠোন টপকে রান্না ঘরেও পৌঁছে গেছে সেই সবুজ বিপ্লব।

সবুজ বিপ্লবজাত খাদ্য উৎপাদনের এনার্জি নিয়ে আমরা যত আলোচনা করব, তত বেশি করে এম এস স্বামীনাথনদের কীর্তিকে সম্মান জানানো হবে। আসলে, স্বামীনাথনদের কাজ বেঁচে থাকবে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের ডি এন এ-তে। স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিমূর্ত শ্রমের মূল্য নির্ধারণে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি দাবিতে সিংঘু বর্ডারে কৃষকের রাত্রি যাপনে। ঐতিহাসিক ভাবে ঐতিহ্যগত ধান কমলা, কবিরাজশাল, জামাইনাড়ু, যুগল, কেরালাসুন্দরী, বহুরূপী, পাটনাই, তালমাড়ি, দানাগুড়ি, মোতিবাস, মহিষলাদান, গোলাপসরু আজ অতীত তার বাস্তবোচিত কারণে। স্বর্ণমাসুরী, আম্রপালী, ধনরাজ, ধীরেন, পুসা বাসমতী, কৌশল্যা, পুষ্পদের মতো আরও কিছু নতুন জাতের বীজ আজ আমাদের ভবিতব্য। এম এস স্বামীনাথনরা এসেছিলেন। তাই আজ ঘরে ঘরে বছরে দু'বার নবান্ন।

খড়িমাটিওয়ালা

ড. অন্তরা চৌধুরি

‘খড়িমাটিওয়ালা ও খড়িমাটিওয়ালা এত ভোরে কোথা যাও?’

‘সে যাব অনেক দূরের গ্রাম এ’।

‘আমাকে একটু খড়িমাটি দিয়ে যাও না!’

‘সে দেব’খন একদিন। আজ চলিইইইই’।

ওরা দাঁড়াত না। কারণ ওদের দাঁড়াবার সময় যে নেই। ওই কটা কথা বলেই আবার ঘন কুয়াশার মধ্যে ওরা হারিয়ে যেত। কুয়াশামাখা ভোরে সেই খড়িমাটিওয়ালাদের কথা বড্ড মনে পড়ে।

ঠাকুমা শিখিয়েছিল পুজোর আগের ক’টা দিন ভোরে উঠতে। বলতেন-

‘শিউলি মাখা ভোরের গন্ধ না পেলে বুঝবি কেমন করে পুজো আসছে!’

ঠাকুমার কথা মতো শরৎকাল পড়লেই ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়তাম। সেই কত ছোটবেলায় রবি ঠাকুরের কবিতা পড়েছিলাম সহজপাঠের পাতায়, ‘এসেছে শরৎ/ হিমের পরশ/ লেগেছে হাওয়ার পরে’। বর্ষা তখন এমন খামখেয়ালি ছিল না। নির্দিষ্ট সময়েই বর্ষা হত। মর্নিং ওয়াক তখনও বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। কাজেই অত ভোরে গুটিকয়েক লোকজনই রাস্তায় বেরোত। রাত শেষ হয়ে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে। কমলা রঙের পূব

আকাশ। কান পাতলেই ঘাসে ঘাসে শোনা যায় শিশিরের শব্দ। মন ভালো করা একটা মিষ্টি হাওয়া।

এই ব্রহ্ম মুহূর্ত বরাবর আমার বড্ড প্রিয়। একা একাই বেরিয়ে পড়তাম সেই সময়। ছোট ছিলাম বলেই হয়ত ভয় কী জিনিস জানতাম না।

তখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং ছিল সিলেবাসের বাইরে। তাই আশ্বিন মাস থেকেই হালকা ঠান্ডা পড়তে শুরু করে দিত। সেই সঙ্গে কুয়াশার আস্তরণ ওই ঊষালগ্নকে বেশ মায়াবি করে রাখত। রাস্তায় যখন বেরোতাম তখন কোনও কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসত 'কোঁকর কোঁক' করে মোরগের আওয়াজ; কোনও বাড়ি থেকে আসত উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ। আমি এক অদ্ভুত নেশার আনন্দে হেঁটে বেড়াতাম।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতাম কুয়াশার আবরণ ভেঙ্গে একটার পর একটা লোক এগিয়ে আসছে সাইকেলে চেপে। সাইকেলের পিছনে বাঁধা থাকত বিশাল বড় এক-একটা বস্তা। গোটা রাস্তা জুড়ে সাইকেলের সারি। চোখের পলকে তারা আবার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেত। প্রথম প্রথম বুঝতাম না- এরা কারা, কোথায় যায়। পরে একদিন জানতে পেরেছিলাম ওরা খড়িমাটিওয়ালা। দুর্গা পুজোর আগেই এদের দেখা যেত। অনেক দূরের গ্রামে আছে খড়িমাটির খাদ। সেখান থেকে খড়িমাটি নিয়ে, তারা দূর দূরান্তের গ্রামে যায় সেগুলো বিক্রি করতে। তাদের জন্যে অধীর আগ্রহে বসে থাকে গ্রাম্য বধূরা।

আমার মনও ওদের সঙ্গে সাইকেলে

চেপে চলে যেত। জানতে ইচ্ছে করত, খুব জানতে ইচ্ছে করত ওরা কোথায় যায়! যেখানে যায় সেই গ্রাম কেমন? কেমন সেখানকার মানুষজন! কল্পনার ডানায় ভর করে আমার মনও হয়ত সেই খড়িমাটিওয়ালার আগেই সেই গ্রামে পৌঁছে যেত।

প্রথম প্রথম অবাক লাগত। আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়, তা সত্ত্বেও অল্প খড়িমাটিই লাগে। অথচ গ্রামে এত বস্তা বস্তা খড়িমাটি কে নেয়! কিন্তু তখন তো আর ব্যাপারটা জানতাম না। কোনও এক গ্রামের লাজনম্রা বধূ এই খড়িমাটি দিয়েই তার সাধের মাটির ঘরটিকে সাজিয়ে তোলে। পুজো আসছে। মা আসছেন। ঘরদুয়ার নতুন করে সাজাতে হবে না! হলই বা মাটির ঘর। গ্রাম্যবধূর সৃজনশীলতা মিশে যায় ওই খড়িমাটির মধ্যে। আর সেই দিয়েই সে অপূর্ব নক্সা করে ঘরের দেওয়ালে। স্বপ্ন আঁকা থাকে তার প্রতিটি আল্পনায়।

কী অদ্ভুত মানুষের জীবন! অল্প একটু টাকার বিনিময়ে অনেকখানি খড়িমাটি কিনতে পাওয়া যায়। অথচ সেই খড়িমাটিতে মিশে থাকে কত পরিশ্রম, কত ক্লেশ, কত অজানা কাহিনি। মাত্র ক'টা টাকার জন্য, কত কষ্টের বিনিময়ে সেই খড়িমাটিওয়ালারা আনন্দ এনে দেয় ঘরে ঘরে। অথচ 'ওর দুঃখের কথা জানবে না জানি কেউ কোনও দিনও।'

এখন আর তাদের দেখতে পাই না। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন খড়িমাটি হয়তো অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে আসে বাড়িতে বাড়িতে। আধুনিক প্রজন্ম হয়তো খড়িমাটি কী জিনিস জানেই না। সেই মাটি দিয়ে কী হয়, খায় না মাথায় মাখে সেসব কিছুই তাদের কাছে অজানা।

ছোটবেলায় ফেলে আসা সেই শারদ শিউলিভোরের সঙ্গে খড়িমাটিওয়ালারাও আমাদের স্মৃতির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

সুন্দরবনের জলদস্যু

শুভেন্দু আচার্য

বাঙালির শীতের বেড়ানোর তালিকায় সুন্দরবন ভ্রমণের অন্তর্ভুক্তি অনেক আগে থেকে। আমার সুন্দরবন দেখা অনেকটা সে ভাবেই। মাধ্যমিকের পর মামা বললেন, 'যাবি নাকি, সুন্দরবন দেখতে?' ব্যস্, আমায় আর পায় কে? বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে, তিন দিন, দু'রাতের প্যাকেজ ট্যুরে চললাম। সঙ্গে মনাদি, জবা আর রাজা। সেই আমার প্রথম বন দেখা। দারুণ মজা হয়েছিল, তবে দু'রাত লঞ্চেই কাটিয়ে ছিলাম। আর, প্রথমবার বনের ধারে কোনও গ্রামে রাত কাটানো, বন্ধু তারাপদর সৌজন্যে। তারাপদ সর্দার, চাকদহ কামালপুর হাইস্কুলের সিনিয়র টিচার। ওর বিয়েতে অ্যানপুরে, ওর গ্রামের বাড়িতে সাত দিন ছিলাম। সেটাও প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। পেশাগত কারণে এরপর বহুবার সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি। কখনও পঞ্চায়েত নির্বাচন কভার করতে, কখনও বা কোনও প্রকল্প উদ্বোধনে মন্ত্রী-আমলাদের সঙ্গে, আয়লার পর, শেষবার গিয়েছি ক'দিন আগে, আমফানের পর। সবমিলিয়ে অভিজ্ঞতাও কম হয়নি।

তবে, সুন্দরবন ভ্রমণের সবথেকে রোমাঞ্চকর ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ২০০৭ সালে। সে কাহিনিই আজ তুলে ধরা যাক। সে সময় একটা বাংলা চ্যানেলের জন্য, আমরা একটু ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করতাম। সপ্তাহে একদিন, একঘণ্টার শো। অল্প ক'দিনের মধ্যেই, বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল আমাদের অনুষ্ঠান। প্রোগ্রামটায় যাতে আরও ভাল কনটেন্ট দেওয়া যায়, আমরা সেই চেষ্টাই প্রতিনিয়ত করতাম। অনেক সময় সে কাজে ঝুঁকি ও ছিল। একবার ঠিক হল, সুন্দরবনের গ্রামে বাস করা

মানুষগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর বিশদে একটা রিপোর্ট করব। অতনু রাহা তখন রাজ্যের মুখ্য বনপাল। তিনি এ বিষয়ে আমাদের সব রকমভাবে সাহায্য করলেন। আর ও একজনের কথা বলতেই হবে, তিনি কান্তি গাঙ্গুলি। সে সময় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন। এই দু'জনের সহযোগিতায়, সে যাত্রায় কাজটা করা সম্ভব হয়েছিল।

এখন যেমন ক্যানিং থেকে ডকঘাট যেতে গেলে ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়া যায়, তখন কিন্তু মাতলা নদী পার হতে হত। ডকঘাট থেকে সড়ক পথে বাসন্তী হয়ে আমরা গোসাবা যাব। কিন্তু, আমরা ডকঘাটে পৌঁছে দেখলাম, রাস্তাঘাট জনশূন্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোনও একটা আঞ্চলিক ইস্যুতে সেদিন ডকঘাট বন্ধ। আমাদের কাছে এই খবরটা ছিল না। তাই, লাগেজ, ট্রাইপড, ক্যামেরা ইত্যাদি লটবহর নিয়ে আমরা বেশ বিপাকেই পড়লাম। শেষে, নিজেদের পরিচয় দিয়ে, অনেক অনুনয়ের পর একজন রাজি হলেন। তাঁর বাইকে চেপে, তবে গোসাবা পৌঁছলাম। তারপর রাঙাবেলিয়া হয়ে সজনেখালির জেটিতে যখন পা রাখলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে বনে। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। এখানে আকাশের তারাগুলো যেন অনেক বেশি উজ্জ্বল। এক ফালি চাঁদের স্বল্প আলোয়, আমরা ট্যুরিস্ট লজের রুমে ঢুকে পড়লাম।

সুন্দরবনে অনেকেই গেছেন। তাই, এই বন সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তবু, কিছু তথ্য জানিয়ে রাখি। বৃহত্তর সুন্দরবন, বিশ্বের সব থেকে বড় সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা মাটির ম্যানগ্রোভ অরণ্য। আয়তনে দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশি। দেশ ভাগের পর বাংলাদেশে এই বনের ৬০ শতাংশ আর আমাদের দেশে ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রায় চার হাজার বর্গ কিলোমিটার অংশ রয়েছে। বর্তমানে দঃ ও উঃ ২৪ পরগণা, এই দুই জেলায় বিস্তৃত একটি জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। এই বনের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কাছ থেকে সুন্দরবনের স্বত্ত্বাধিকার নিয়ে, এর মানচিত্র তৈরি করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে, এই বনের আয়তন ছিল প্রায় দ্বিগুন। ১৮২৯ সালে সার্ভে অফিসার এল.টি .হজেস সাহেবের জরিপে এই তথ্য জানা যায়। পরের বছর, ড্যাম্পিয়ার এবং হজেস, এই দুই সার্ভে অফিসার সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চলের উত্তর সীমা নির্ধারণ করেন। তাঁদের নাম অনুসারে, এই রেখার নাম রাখা হয়। সুন্দরবনের প্রথম বিভাগীয় বনকর্তার নাম এস.ইউ.গ্রিন। ১৯৭০ সালে ভারতীয় বনের অংশ ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত হয়। অভয়ারণ্যের মর্যাদা পায় ১৯৭৭ সালে। তারপর ১৯৮৪ সালে জাতীয় উদ্যান, ১৯৮৭ সালে বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী বন এবং ১৯৮৯ সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষিত হয়। অসংখ্য নদী-নালা বেষ্টিত সুন্দরবনে, বঙ্গোপসাগরের ৭.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত জোয়ার, অধিকাংশ সময় দেখতে পাওয়া যায়। আমারও সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। পরে, সুযোগ পেলে সে কাহিনি আপনাদের জানাব। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে ছোট বড় প্রায় দুশো বদ্বীপ। বন সংলগ্ন মাত্র চুয়ান্নটা দ্বীপে মানুষের বাস। বৈদ্যুতিক আলো, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য কোনওটাই নেই অধিকাংশ দ্বীপে। শুধু কৃষি আর নদীর মাছ সংগ্রহ, এই ছিল জীবিকা। তুলনায়, অবৈধ উপায়ে বেঁচে থাকার সহজ পন্থাকে বেছে নিয়েছিল তারা।

সে সময় সুন্দরবনকে ঘিরে অপরাধ দিন দিন

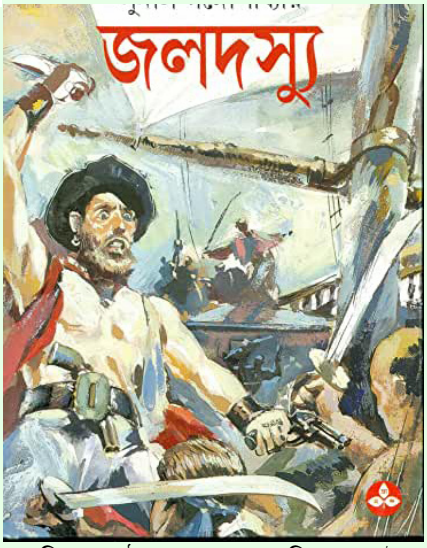

বাড়ছিল। কাঠ পাচার, চোরা শিকার, অবৈধ উপায়ে মধু, মাছ ও কাঁকড়া সংগ্রহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে হরিণের মাংস বিক্রি, বাঘের চামড়া বিক্রির ঘটনাও শোনা যাচ্ছিল। আর বনদপ্তরের পারমিশন নিয়ে যাঁরা বনের গভীরে মাছ, কাঁকড়া, কাঠ, মধু ইত্যাদি সংগ্রহে যেতেন, তাঁদের জলদস্যুদের মোকাবিলা করতে হত। জেলে বা মওলিদের আটকে রেখে পণ আদায় করা, সঙ্গের জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হত, এই নৃশংস জলদস্যুদের হাতে। তবু, বেঁচে থাকার তাগিদে, প্রাণ হাতে নিয়েও বন সংলগ্ন গ্রামের বেশ কিছু মানুষ, এই কাজে লিপ্ত ছিলেন।

বন দপ্তর এই সহজ সত্যিটা বুঝেছিল যে, শুধুমাত্র বনকর্মীদের দিয়ে এই সুবিশাল বনকে বাঁচানো সম্ভব নয়। বন পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষকে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে, তবেই বন বাঁচানো সম্ভব। তাই, গ্রামের মানুষদের নিয়ে তৈরি হল ই.ডি.সি বা ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি। ধীরে ধীরে অধিকাংশ গ্রামবাসী এর আওতায় এলেও, চোরাগোপ্তা অপরাধ লেগেই ছিল। বন বাঁচলে, গ্রাম বাঁচবে এই সহজ সত্যিটা বুঝলেও, অপরাধ ঠেকানো যাচ্ছিল না। আর বাড়ছিল, বনের গভীরে পারমিট নিয়ে যাওয়া জেলে, মউলিদের ওপর জলদস্যুদের আক্রমণ। এরা এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, অনেক সময় বনের পাশের গ্রামে হামলা করত, ফসল লুঠ করে গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। পুলিশ কিম্বা বন দপ্তর ওদের টিকিও খুঁজে পেত না।

মূলস্রোত কাগজ বা চ্যানেলে এসব ঘটনা সেভাবে উঠেও আসত না। এখনও এইসব ভয়ঙ্কর ঘটনা আড়ালেই থেকে যায়।

বাচ্চু সর্দার এর নাম আমি প্রথম শুনি দয়াপুরে। তারপর শান্তিগাছি, কুমীরমারি যেখানেই গেছি, প্রায় সবাই ওর নাম করেছেন খুব সাবধানে, ভয়ে ভয়ে। সুন্দরবনের এক সময়কার ভয়ঙ্কর জলদস্যু বাচ্চু। ওকে ঘিরে সুন্দরবনের আনাচে কানাচে কত মিথ, কত গল্প ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। বাদাবনের বেতাজ বাদশা। পুলিশের হাতে কখনও ধরা পড়েনি। বন দপ্তরও ওর হদিশ পায়নি। বাচ্চুর বাড়ি ঝড়খালিতে, এটা ছাড়া আর কোনও ইনফর্মেশন জোগাড় করতে পারিনি। তখন বাচ্চু সর্দারকে ভয় পায় না, এমন মানুষ গোটা সুন্দরবনে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। আরও কিছু ইনফর্মেশনের তাগিদে, যখনই সবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, হয় সবাই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন, না হয় অতি সাবধানে তার গুণগান করেছেন।

ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক, এই বাচ্চু সর্দারকে খুঁজে বের করতেই হবে। তার ইন্টারভিউ নিতেই হবে। চিরকাল ক্রাইম নিয়ে কাজ করছি। চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমাশ তো কম দেখিনি, এবার না হয় জ্যান্ত জলদস্যু দেখব। অফিস থেকে পারমিশন পেয়ে, চললাম ঝড়খালিতে।

বাচ্চুর বাড়ি ঝড়খালির নবাবগঞ্জের গরাণবোস গ্রামে। একসময় জনমজুরি আর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা ছাপোষা বাচ্চু, হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর জলদস্যু হয়ে উঠল কেন, প্রশ্নটা মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঝড়খালিতে রবিনহুড ইমেজ ওর। তাই ইতিউতি জিজ্ঞাসা করেও কোনও সুরাহা হচ্ছিল না। ঠিক করলাম, সোজা যাব বাচ্চুর বাড়িতে। তারপর যা হওয়ার হবে। কিন্তু বাড়িতে গেলেই কি আর ওকে পাওয়া যাবে? সে তো এত সুবোধ বালক নয়। সফর সঙ্গী ফটোগ্রাফারের মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। মনে মনে নির্ঘাত আমাকে গাল পাড়ছে আর বলছে, কী দরকার ছিল এই ইন্টারভিউর।

ভ্যান রিক্সায় নবাবগঞ্জ তো পৌঁছলাম, এবার গরাণবোস গ্রামে যাই কী করে? একটা চায়ের দোকানে কিছু মানুষ জন ছিলেন। চা খেলাম, ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ওঁরা কেউই বাচ্চুর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারলেন না। আমার মন বলছে, ওঁরা সবাই জানেন, তবুও বলবেন না। বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমরা কারা, কোথা থেকে আসছি ইত্যাদি। সাংবাদিক মন কিন্তু অন্য কথা বলছে। ওঁরা আমাকে বাচ্চুর কোনও কথা বলেননি, এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সব কথাই যে বাচ্চুর কানে পৌঁছবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কাছেই বামফ্রন্টের (আর.এস.পি) একটা মিটিং চলছে, সেখানে গেলে হয়ত একটা সুরাহা হতে পারে, এটা ভেবে মিটিং স্থলে গেলাম। কান্তিবাবুকে ফোন করলাম। উনি স্থানীয় এক নেতাকে বললেন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এতদিন পর সেই নেতার নাম আজ আর মনে নেই। তবে এটা মনে আছে, বাচ্চু সর্দারের বাড়ি যাব শুনে, তিনিও খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। অন্য কেউ হলে হয়তো তিনিও এড়িয়ে যেতেন, কিন্তু মন্ত্রীর নির্দেশ, তাই ফেলতে পারেননি। শেষে তার সহযোগিতায় একটা নৌকা ভাড়া করে, বিদ্যাধরী নদী ধরে কানমারি খালে এসে পড়লাম। এই খাল বয়ে গেছে গরাণবোস গ্রামের পাশ দিয়ে। বাচ্চুর পৈতৃক ভিটে এখানেই। এক হাঁটু কাদা ঠেলে কোনও মতে বাচ্চুর বাড়ির সামনে যখন দাঁড়ালাম, ঘড়িতে তখন দুপুর একটা। নাম ধরে ডাকতেই, এক মাঝ বয়সী মহিলার স্পষ্ট জবাব, বাড়ি নেই, কোথায় গেছে, কবে আসবে জানি না। কী আর করব, ফিরে চললাম। অবশ্য, এটা জানাই ছিল যে, বাচ্চুকে বাড়িতে পাব না। বাড়ির ছবিটা তো পাওয়া গেল।

ফেরার সময় আবার সেই নবাবগঞ্জের চায়ের দোকান। খিদের জ্বালায় পেটাই পরোটা আর ঘুঘনি গোগ্রাসে গিলছি, হঠাৎ-ই চার পাঁচটা ভ্যান রিক্সায় প্রায় ২০-২৫ জন লোক চায়ের দোকানে এসে থামল। রীতিমতো ধমকের সুরে বাজখাঁই গলায় একজন জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, কে আমার খোঁজ করছে?' চা দোকানী আমাকে দেখিয়ে নিচুস্বরে কিছু বলতেই লোকটা আমার দিকে সরাসরি আসতে লাগল। চায়ের দোকানের ভেতরটায় আলো কম, তবু ক্যামেরা ম্যানকে বলা ছিল, কোন সিচুয়েশ্যন মিস করা যাবে না। ওকে ইশারা করে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আমি কিছু বলার আগেই, বাচ্চুর নির্দেশ, বাইরে আসুন। রাস্তার ওপারে অনেকটা খালি জায়গা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ক্যামেরা চলছে। আমি ভাল করে বাচ্চুর দিকে তাকালাম। লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট হবে, গায়ের রং বেজায় কালো, তবে চোখ দুটো মারাত্মক লাল। গায়ে নস্যি

রঙের ফতুয়া আর চেক লুঙ্গি। কাছে যেতেই হাড়িয়ার গন্ধ নাকে এল। জবা ফুলের মতো লাল চোখের কারণ বুঝতে পারলাম। শুধু ও নয়, ওর সঙ্গীরাও এই ভরদুপুরে এক পেট হাড়িয়া টেনে বসে আছে। আমি কলকাতা থেকে আসা নিরীহ এক সাংবাদিক জেনে, ও নিজে আশ্বস্ত হল। সঙ্গীদের একটু তফাতে যেতে বলল। বুঝলাম, ঝামেলা হতে পারে এই আশঙ্কায় রীতিমতো তৈরি হয়ে এসেছে বাচ্চু। কে জানে, কে ওর কান ভারি করল?

'বলুন, কী জানতে চান'– বাচ্চুর সরাসরি প্রশ্ন আমার দিকে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হাড়িয়ার প্রভাবে ও টলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'জলদস্যুর জীবন ভাল লাগছে?' কিছু সময় চুপ করে, বাচ্চু বলল, 'না লেগে আর উপায় কোথায়?' তারপর আমাকে আর প্রশ্ন করতে হয়নি। ও নিজেই বলতে শুরু করল, ওর ফেলে আসা অতীত জীবনের কথা। কানমারির খাল ধরে, বিদ্যাধরী নদী বেয়ে বাচ্চু আর তার দলবল কত যে নিরীহ, অসহায় মানুষকে নিঃস্ব করেছে, তার ইয়ত্বা নেই। লুঠতরাজ, পণবন্দি, ডাকাতি, মানুষ খুন, কী করেনি এরা? এত অপরাধ করার পরেও, এরা কীভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়, কে জানে? পুলিশের খাতায়, বাচ্চু ও তার দলবল তখনও ফেরার। অথচ, প্রকাশ্য দিবালোকে শুধু ঝড়খালি নয়, গোটা সুন্দরবন অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বাচ্চু সর্দার ও তার দলবল। তবে, এ অঞ্চলের কোনও গরীব মানুষের জন্য বাচ্চুর দরজা খোলা। বাচ্চুর কাছে যে কেউ সাহায্য চাইলে পায়। সে কারণেই হয়ত, বাচ্চুর বিরুদ্ধে কোনও কথা কেউ জানলেও বলে না। একসময় অভাবের তাড়নায় ডাকাতির জীবন বেছে নিয়েছিল ও। এখন যথেষ্ঠ স্বচ্ছল অবস্থা। তিনটে বিয়ে। বড় বউ থাকে গরাণবোস গ্রামে, যাকে ইতিমধ্যেই আমরা দেখে এসেছি। মেঝ বউ এর সঙ্গে ত্রিদিবনগরে থাকে বাচ্চু। আর, ছোট বউ থাকে সন্দেশখালিতে। দুটি মেয়ে আর চার ছেলে, মোট ছয় ছেলেমেয়ে বাচ্চুর। আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, 'এই অপরাধের জীবন কবে ছাড়বে?' কোনও জড়তা না রেখে স্পষ্ট জানাল, 'অভ্যাস আর দল চালানোর তাগিদ যে দিন মিটে যাবে, সে দিন।' বুঝলাম, স্বাভাবিক জীবনে আর কোনওদিনই ফিরতে পারবে না, সুন্দরবনের হাড় হিম করা জলদস্যুদের সর্দার।

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। ওর দলের লোকেরাই একটা ভ্যান-রিক্সা ঠিক করে দিল। আমরা ফিরে যাব ঝড়খালি হয়ে গোসাবায়। বাচ্চু নাত নেড়ে বিদায় জানাল। সত্যি বলতে কী, সুন্দরবনের ত্রাস, একজন জলদস্যুকে হাত নেড়ে বিদায় জানাব, এটা ভেবে মন একটু দ্বিধায় ছিল, শেষে আমিও হাত নেড়ে বাচ্চুকে বিদায় জানালাম। রাত আটটায় গোসাবা পৌঁছলাম। পরদিন ফিরে এলাম কলকাতায়।

ছবি: প্রতীকী

গল্প

লালচে লাল–হলুদ সময়

কুণাল দাশগুপ্ত

ঘুম থেকে উঠেই সুবিমল বাবু ফাইল বন্দি জরাজীর্ণ কাগজটাকে বের করে চোখ বোলাতে লাগলেন। তাপ্পি দেওয়া ছেঁড়াফাটা কাগজ। কাগজ মানে 'দৈনিক সংবাদ'। সময় ওই হলদেটে কাগজের প্রায় সব অক্ষরই শুষে নিয়েছে। শুধু হেডলাইনটা পড়তে পারা যায়। 'পাশ ফেল করলো ইস্টবেঙ্গলের কাছে, শিল্ড রয়ে গেল দেশেই।' ১৯৭০ সালে এই দিনেই ইরানের পাশ ক্লাবকে পরিমল দের শেষ মুহূর্তে করা গোলে ইস্টবেঙ্গল হারিয়ে দিয়েছিল।

প্রতিবছর এই দিনে কাগজটাকে দেখার চেষ্টা করেন সুবিমল চন্দ। এককালের নামী ক্রীড়া সাংবাদিক। বয়স চোখ রাঙাচ্ছে প্রতীক্ষণে। তবু এ যেন এক অন্য দিন। টেনে হিঁচড়ে স্মৃতিকে সচেতন মনে নিয়ে আসার প্রাণপাত্র চেষ্টা করেন। লাল হলুদ আবেগটা যেন এখনও সতেজ। পাশের পাড়ার বৃদ্ধাশ্রমে থাকা আরতির সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা আর বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে পারে না।

আরতি মজুমদারের সঙ্গেই দাদা সুদীপ চন্দর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সেটা তো আর হয়ে উঠল না। ভূখণ্ডের স্বাধীনতার পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের নোয়াখালী থেকে চন্দ পরিবার গড়িয়া অঞ্চলে চলে আসে। অতুলচন্দ ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। এক স্পষ্ট বাক বামপন্থী। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ইতিহাস মানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, বরং মানুষের শ্রেণী সংগ্রাম। ক্লাসে জোর গলায় বলতেন, ভারতের ইতিহাস বড্ড বেশি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। সত্যের দলিলকে অনেক সময়ই গল্পগাথায় পরিণত করেছেন ঐতিহাসিকরা। এমন দাপুটে বামপন্থী বাবার বড় সন্তান সুদীপ যে বাম পথেই চলবে এতে আর সন্দেহ কি।

সুদীপ বাংলার ছাত্র ছিল। গল্প– কবিতায় সমানভাবে সাবলীল। বামপন্থী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত তার গল্প, কবিতা। আরও একটা বিষয় অনুরাগী ছিল সে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি বাঁধভাঙ্গা ভালবাসা। বাম নেতৃত্বের সঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল মাঠে যাওয়া ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। ওই সবুজ আয়তক্ষেত্র টাই সুদীপের লেনিনগ্রাদ। গ্যালারিতে বসে যখন লাল হলুদের জয়ধ্বনি করত, মনে হত লেনিনের সঙ্গে একই মঞ্চে ইন্টারন্যাশনাল গাইছে। ইস্টবেঙ্গল জিতলে ডাকা বুকো ছেলেটার দাপট বাড়ত চতুর্গুন। এক বুক লাল- হলুদ রং নিয়ে লাল পতাকা হাতে 'জোট বাধো তৈরি হও' স্লোগানে শোনা যেত আগামীর জয়ধ্বনি। ভিটে মাটি হিন্দের জমির লড়াইই আরতির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল তরুণটিকে। তার দৃপ্ত স্লোগান যেন সলিল চৌধুরির গান হয়ে বিঁধে গিয়েছিল আরতির বুকে। প্রণয়ের প্রথম পাঠ ওখানেই।

বাম আন্দোলন যে কার্পেট বিছানো পথে হয় না সেটা জানত সুদীপ। পদে পদে বিপদের হাতছানি। দুর্বৃত্তের হুমকি, রাষ্ট্রের পাহারাদারদের আক্রমণের মাঝেই চলত প্রেম পর্ব। আরতি খুব ভাল গাইতে পারত। সব ধরনের গান। এমনকি হিন্দি গানও। সেটা কখনও প্রেমের মাঝে প্রাচীর তোলেনি। কারণ সুদীপ মনে করত আবেগ ছাড়া বিপ্লব হয় না। আর মার্কসবাদ কখনই যন্ত্র তৈরি করে না। সব ধরনের লড়াইয়েই সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল আরতিকে। একবার ইস্টবেঙ্গল মাঠ থেকে সন্ধ্যা বেলা ফেরার সময় ঘিরে ফেলেছিল বিরোধীরা। মাথা ফেটে গিয়েছিল সুদীপের। এক বামপন্থী চিকিৎসকের ওষুধ আর আরতির সুশ্রুশায় সুস্থ হয়েছিল সে।

সুবিমল সুদীপের থেকে বছর চারেকের ছোট। লাল আর লাল হলুদ ছিল তারও চেতনা জুড়ে। তবে অত প্রকট নয়। দাদার মতো তারও লেখার হাত ছিল চমৎকার। কিছুটা দুর্বল চিত্তের হওয়ায় মিটিং মিছিলে যেত না সুবিমল। শান্ত স্বভাবের হলে যা হয়। দাদার মতো মনোভাব ছিল না। অতুলবাবুর প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল বড় ছেলেকে ঘিরে।

মা স্নেহলতা দেবী সুদীপকে নিয়ে যতটা চিন্তায় থাকতেন, অতুল চন্দ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। জানতেন সুদীপের মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ড থেকে যে স্নায়ু রাশি দেহজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার প্রতিটিতে মার্কসীয় ভাবনা বয়ে চলেছে প্রতিক্ষণে। লালচে ভোরের গর্ভে এক শ্রেণীহীন সমাজের ভ্রূণ যে মাথা তুলবেই এমনই ইস্পাত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার।

সে কারণেই সেদিন সন্ধ্যা বেলা যখন লাল কাপড়ে ঢাকা সুদীপের দেহটা 'জাগো জাগো সর্বহারা' গাইতে গাইতে নিয়ে যাচ্ছিল পার্টি কমরেডরা, অতুলচন্দ্রের চোখের কোলে আনন্দাশ্রু নাকি বিষাদের বিন্দু চুয়ে পড়ছে তা বলার সাধ্য মহামান্য ফ্রয়েড বা পাবলভেরও ছিল না। দুর্বৃত্তের বুলেট সুদীপের বুক চিরে বেরিয়ে গেলেও লালচে লাল–হলুদ চেতনা, ভালোবাসা প্রাণবন্তই ছিল। অফুরান ভালোবাসা নিয়ে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় আরতি। একাকিত্বই যেন তার প্রেমের সৌধ হয়ে রইল।

সুবিমলের ভিতরে সেই শান্ত স্বভাবের গুণগত পরিবর্তন হতে লাগল। দাদার আগুনে মতাদর্শই তার লেখার বিষয়ে হবে স্থির করে নেয় সুবিমল। পার্টির এক নেতার হাত ধরেই পৌঁছে যায় দৈনিক সংবাদ এর দপ্তরে। চাকরিটা হয়েও যায়। তবে রাজনীতি নয়, ক্রীড়া দপ্তরে। ওই বিভাগে সাকুল্যে তিনজন কর্মী। সুবিমল মাঠ চষে বেড়াত। খবর সংগ্রহ করত। ডেস্কে ছিল কিছুটা সিনিয়র ভূদেব বসু। আর ক্রীড়া সম্পাদক শান্তিদেব চৌধুরি। আর ছিল এক চিত্রসাংবাদিক।

নাটকীয় ঘটনা ঘটল সত্তরের শিল্ড ফাইনাল এর আগের দিন। ম্যাচ রিপোর্টের দায়িত্বে ছিল শান্তিদেব চৌধুরি। ইডেনে তাঁরই যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রবল জোরে কাবু হয়ে গেলেন তিনি। সুবিলের হাতে যেন লটারির টিকিট। তাকেই করতে হল ম্যাচ। সুবিমলই দৈনিক সংবাদ এর পরিমল দে। শেষ মুহূর্তের সুযোগেই বাজিমাত।

পরের দিন সুবিমলকে ঘিরে অফিসে হই হই কাণ্ড। ম্যাচ রিপোর্ট তো নয়, যেন আমেদ খানের ড্রিবলিং। 'পাশ ক্লাবের হাতে পাসপোর্ট ধরিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল।' এই লাইনটা নাকি পাঠক কূলের হৃদয়ে লাল হলুদ আলপনা এঁকে দিয়েছিল।

উদাসীন সুবিমল সেই রাতে বাড়ি ফিরে চেয়ারে রাখা সুদীপের ছবির সামনে দৈনিক সংবাদ ভাঁজ করে রেখে রেখে দিয়েছিল। দাদাকে আর কীভাবে শ্রদ্ধা জানাবে, জানা ছিল না তার।

গল্প

চক্ষুদানের আগমনী

ডা. সৌম্য গায়েন

সম্বচ্ছরের ভোরের থেকে আজকের ভোরটা আলাদা। অন্য সকালগুলো আসি আসি করেও ঘুমের ওমটাকে ছাড়তে চায় না, মানে আমি যে ঘুমোচ্ছি সেটা বুঝে স্বর্গসুখ অনুভব করছি— আর পাঁচটা সাধারণ ভোর এই জঁরের মধ্যে পড়ে। আজকের ভোর কিন্তু ঘুম কেড়ে নেওয়ার ভোর।

‘আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির..’

সদ্য পল্লবিত আঁখির পাপড়ি মেলার নির্যাসটুকু নিয়ে টলোমলো পায়ে এসে পড়ে এই মহালয়ার ভোর। শ্রান্ত শিল্পীর ঘর্মাক্ত পেলব সহস্রমুদ্রার কাঠিন্যে তার মানসকন্যার চোখ মেলার দিন। যার অপার্থিব চাহনী ধুয়ে দেবে এতদিনের সমস্ত শোষণ আর বঞ্চনার তপ্ত বালুর ঢিবি। স্রষ্টার মুগ্ধতায় মিলে যাবে শিল্পের বাঙ্ময়তা। এমন দিনে সমস্ত তর্ক বিতর্ক দূরে সরিয়ে আমরা বরং একটা আলোর গল্প করি। অনেক দিন আগে রাশিয়ার একটা লোককথা.....

জায়গাটা রাশিয়ার পূবে বিস্তীর্ণ স্তেপের একটি ছোট্ট জনপদ। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যভূমি দিয়ে ঘেরা। এখানকার অধিবাসীরা মূলত পশুপালক। তারা শান্ত এবং আরামপ্রিয়। এ অঞ্চলের মাটি, শস্য আর অরণ্য তাদের অনেক কিছু দিয়েছে। লোকের গোলায় শস্য আছে, গাছে গাছে ফল আছে, পাখিদের গান আছে, নদীতে জল আছে; আর আছে তাদের অন্তহীন ভালবাসা। এরকমটাই চলত যদি না মারিয়ার কথায় তাদের ভীমরতি ধরত। মারিয়া ছিল অন্যরকম। সে ছিল অবাধ্য বাতাসে ভেসে আসা উলম্ব মেঘের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আসলে সে পছন্দ করত ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য, চাইত সবার রানী হয়ে সবার উঁচুতে থাকতে। তাই ধীরে ধীরে সে গল্প বলা শুরু করল,- বিত্তের গল্প, বৈভবের গল্প, বিনা পরিশ্রমে আয় করার গল্প। মানুষের কৌতূহল অসীম, কৌতূহলই তাকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করেছে। মারিয়ার গল্পেরাও ওই কৌতূহলের রথে সওয়ার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নিমেষে। কেউ বিনা বাধায় বিশ্বাস করল, কেউ ভাবল, এমনটা তো হতেও পারে, কেউবা ভাবল, কি জানি! যদি এমনটা না হয়? তবে দেখা গেল বিশ্বাসীর সংখ্যা দোদুল্যমান মানুষের থেকে ঢের বেশি। আসলে সবার হয়েছিল ‘সুখের অসুখ’। তাই তারা ভাবল মারিয়ার গল্পের দেশ কোনও স্বর্গরাজ্য হবেই

বা! এক মরে আসা বিকেলে মারিয়া সবাইকে জনপদের মাঠটিতে জড়ো করল। বলল—

‘ভাইসব! আমরা কি চিরকাল এভাবে স্তেপের তৃণ হয়ে বেঁচে থাকব? আমাদের কি আরও সুখের আশা থাকবে না? আমার গল্পের দেশটায় গিয়ে কি আমরা পায়ের উপর পা দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করব না? উত্তরের দিকে তাকাও ভাইসব! এবার ডানদিকে চলো। ডানদিকে, আরও ডানদিকে আছে সেই দেশ। হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের। চলো, আর দেরি নয়। এখনই বেরিয়ে পড়ি। আমি দেখাব সেই দেশ, আমি দেব তোমাদের সেই জীবন! তোমরা কি আমায় ‘রানী’ বলে ডাকবে না?’

মাস্ হিষ্টিরিয়া বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই বলে উঠল, ‘তুমি! তুমিই আমাদের রানী! মারিয়া!’

মারিয়া একবার চোখ বন্ধ করে অনুভব করল, যেন সমস্ত পৃথিবীটাই গড়াগড়ি যাচ্ছে ওর পায়ের তলায়। ওর সমস্ত চেতনার তারে তারে বেজে উঠল, ‘আমিই রানী, আমিই রানী।’ একমুহূর্ত চারপাশটা দেখে নিয়ে সে চলতে শুরু করল ডাইনে, আরও ডাইনে.....

রানী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মারিয়া তখনও জানে না সেই ছোট্ট জনপদের ডানদিকে অর্থাৎ যেদিকে সবাই চলতে শুরু করেছে, সেদিকে আছে নিবিড় অরণ্য। ভীষণ ভয়াবহ আর হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। সে জায়গাটা রাশিয়ার উত্তর পূর্বে সাইবেরিয়ার মেরুপ্রদেশের কাছে। দিনমানে সে এক চির আঁধারের রাজ্য। জানত শুধু একজন;- দাঙ্কো। দাঙ্কো এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল। সে জানে এখন মারিয়ার প্রতিবাদ করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। বেশ কয়েকদিন ধরে দাঙ্কো আশেপাশের সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল, মারিয়া আসলে কী চায়! দাঙ্কোর দুর্ভাগ্য, কেউ বোঝেনি। সবাই

ভেবেছিল দাঙ্কো মারিয়াকে হিংসে করছে। আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গে দাঙ্কোও চলতে শুরু করল। তবে জনপুঞ্জের মাঝখানে নিজেকে রাখল দাঙ্কো। সে জানে সামনের ভয়ঙ্কর বিপদের থেকে বাঁচতে এই একমাত্র উপায়।.....

ভীড়টা এগোতে এগোতে দেখল স্তেপের তৃণভূমি বদলে যাচ্ছে। আশপাশের মহীরুহ ধীরে ধীরে আকাশ স্পর্শ করছে। বেলা পড়লে প্রকাণ্ড গাছগুলো যেন ওদের গিলে খেতে আসছিল। ওরা এতক্ষণে মারিয়ার জাদুর মোহমায়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ভয় পেতে শুরু করেছে। এই সময়েই ঘটল ঘটনাটা। ঝপ্ করে সূর্য লাফ দিল চরাচরের দিকচক্রবালের একেবারে গভীরে। বেলা যদিও বাকি ছিল অনেকটাই। চোখে মারিয়ার মায়াকাজল মাখা মানুষগুলো এর জন্য প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। ভীড়ের মধ্যে আর্ত চিৎকার উঠল একটা। পাশে, পিছনে সড়সড় শব্দের সাথে সেই কলরবে চাপা পড়ে গেল কিছু হতভাগ্য মানুষের শেষ আর্তনাদ। ওরা জানত না এতক্ষণ ধরে ওদের অলক্ষ্যে ওদের অনুসরণ করে আসছিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। নিশ্চুপ অন্ধকারের সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার শুরু করেছে তারা। মারিয়া এবার বলে উঠল,

-'ভয় পেও না ভাইসব! আঁধারের পরেই আছে আল। এই পথটুকু চলো আমরা মশাল জ্বেলে পার হয়ে যাই।'

সবাই যে মারিয়ার কথা এবার বিশ্বাস করছিল তা নয়। কিন্তু মশাল ছাড়া উপায়ও বা কি আছে! যার যা কাপড় আছে গাছের ডালে জড়িয়ে নিয়ে জ্বলল মশাল। অরণ্য শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ

দেখা গেল না, বরং গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করল তারা। দাঙ্কো বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। সবার অজান্তে একটা একটা করে মানুষ কমছিল। আরও অনেকক্ষণ চলার পর পায়ের কাছে এবার ঘন হয়ে এল ঝোপ। আকাশছোঁয়া অরণ্য যেন চকিতে জড়িয়ে ধরল চরৈবেতির ইচ্ছেটাকে। হঠাৎ চরাচর কাঁপিয়ে বাতাস বিদীর্ণ করে শোনা গেল চিতার হুঙ্কার। এতক্ষণের গলায় কোয়ারানটিন থাকা ভয় এবার আগল ঠেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মানুষগুলোর বুকে। আর সেই বিপদের কণ্ঠলগ্না হয়ে শোনা গেল মারিয়ার অস্ফুট আর্তি। তীব্র ঝটপটানি দূরে মিলিয়ে যেতেই সবাই বুঝতে পারল শিকার ধরে আজকের মতো সরে যাচ্ছে স্তেপের রাজা। এবার মারিয়া বিহীন দলটা সোজাসুজি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এদিক ওদিক ছুটতে থাকা দিশেহারা মানুষগুলোর হাতের মশালেরা নিভে যেতে থাকল একে একে। চিৎকার করে উঠল দাঙ্কো,

-‘বন্ধুরা, দোহাই তোমাদের! ভয় পেয়ে লড়াই হেরে যেও না। মানুষ ভুল করে, আবার মানুষই ইতিহাস গড়ে। কোনাকুনি ফের সবাই, এগিয়ে চলো বামদিকে। ওদিকে আছে সবুজ উপত্যকা, চাষের জমি, নদীর জল। চলো, আবার আমরা ঘেমে নেয়ে গড়ে তুলি আমাদের জীবন। ওপথে চড়াই অনেকটাই; তবে আমাদের উদ্যমের কাছে সে হেরে যাবে নিশ্চয়ই।’

—‘আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। আমাদের আলো দাও দাঙ্কো।’— মানুষের আকূলতা আছড়ে পড়ল দাঙ্কোর প্রতি। শেষ মশালটা নিভে যাওয়ার আগেই দাঙ্কো ছিঁড়ে আনল তার হৃদপিণ্ড। আগুন জ্বালিয়ে দিল তাতে। দু হাতে উঁচু করে তুলে ধরল দাঙ্কো, তার জ্বলন্ত হৃদপিণ্ড। দাউ দাউ আগুনে চারপাশের গোগ্রাসী অন্ধকার ছিঁড়ে ফেলল সেই জ্বলন্ত হৃদপিণ্ড। চেতনার আলোয় নিবিড় অরণ্যের বুক চিরে দুরন্ত দৌড় দিল একদল বদলে যাওয়া মানুষ।.....

কে জানে কতক্ষণ তারা দৌড়েছিল! তাদের সবার পা যখন অবশ হয়ে এল, অবাক হয়ে তারা দেখল ভোরের চাঁপারঙের আলো উঠে আসছে দিগন্ত সবুজ উপত্যকা জুড়ে। তারা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল। চকমকি পাথরের মতো এ ওকে চুম্বন করতে করতে তারা দেখল, অদূরেই নিথর হয়ে পড়ে আছে দাঙ্কো। তার হাতে তখনও ধরা ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা হৃদপিণ্ডটা..

* * *

গল্পটা এখানেই শেষ। হঠাৎই কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা মনে পড়ে গেল,-

-‘অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা....’

গল্প পরেও অনেক হবে, তার আগে এই শরতে প্রার্থনা করি, মানুষের অন্তরের চক্ষুদান হোক। আমাদের সবার মধ্যে ছেঁড়া হৃদপিণ্ডের শপথ নিয়ে গর্জে উঠুক এক একজন দাঙ্কো।

গল্প

প্রতীক্ষার অবসান

বিশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত

কলকাতা শহরের কোলাহল থেকে অনেকটাই দূরে ওড়িশার কন্ধমাল জেলায় রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত অতি মনোরম এক শৈলশহর। পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন শৃঙ্গগুলি উঁচুনিচু ছন্দে ঘন সবুজে বেষ্টিত এই শহরটিকে ঘিরে আছে। চারিদিকে এক নিবিড় নিস্তব্ধতা। চোখ মেলে তাকালে পাইন গাছের জঙ্গল, বিস্তীর্ণ শালবন, গোলমরিচ আর কফির বাগিচা কিংবা ধুধু প্রান্তরের সবুজ উপত্যকা সারা দেহমনে এক অনাবিল আবেশ এনে দেয়। সন্ধ্যে নামলে আদিবাসীদের মাদল বাজিয়ে গানের সুর ভেসে আসে। ভ্রমণ পিপাসু মানুষজনদের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল, কলেজ থেকে শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে আসেন শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্যে।

অলিখিত এক প্রথা অনুযায়ী এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ শেষ করে চলে যাওয়ার আগের দিন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকারা এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ‘গেট টুগেদার’ করেন। ছোটখাটো এক আলোচনা সভাও হয়। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই অঞ্চলের নানা বিষয়ের অনেক অজানা তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পেশ করেন। আজ সেই রকমই এক আলোচনার শেষে অনির্বাণ মুখার্জি তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, ‘এই একটুখানি পথ আজ আমি

হেঁটেই বাংলোতে চলে যাব।'

অনির্বাণ মুখার্জি। বয়স প্রায় ৫০ ছুঁই ছুঁই। গায়ের রঙ ফর্সা, সুন্দর স্বাস্থ্য আর প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। মাথা ভর্তি ঘন কাঁচা-পাকা চুল। চোখে দামী রিমলেস বিদেশি ফ্রেমের চশমা। গলার স্বরটি গমগমে, সব মিলিয়ে বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ঠোঁটের কোনায় প্রায় সবসময় সুগন্ধিযুক্ত লম্বা দামী চুরুট। এখানকার বন দপ্তরে খুবই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। সরকারি বিশাল বাংলোর বড় হলঘরটার পর্দাটা সরিয়ে কাঁচের জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে টের পেলেন বাহিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। গায়ের দামী কাশ্মীরি শালটাকে ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে সবে বিদেশি স্কচের বোতলটা খুলেছেন, ধনঞ্জয় এসে বলল, 'স্যার, বাংলোর গেটে দারোয়ানের কাছে দু'জন মহিলা এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী অচেনা লোকেদের দারোয়ান দেখা করতে না দেওয়াতে তাঁরা বলছেন তাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন আর আপনার সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি। একটিবার দেখা করেই চলে যাবেন। অনির্বাণ অবাক হয়ে একটু চিন্তা করে স্কচের বোতলটাকে সরিয়ে রেখে ধনঞ্জয়কে বললেন, ওঁদের ভিতরে নিয়ে এস।

অনির্বাণের যেন আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভালকরে দেখে নিয়ে এক অতি বিস্ময় দৃষ্টি সহকারে বললেন, 'মেঘমালা তুমি? তুমি এখানে? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।' তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমরা দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন! ভিতরে এস। একটুক্ষণ চুপ করে মেঘমালাকে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে ইনি কে? তারপরে একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর বললেন, 'তোমাকে একেবারে আমার বাংলোতে দেখে আমি সত্যি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। যাক, এবার তোমার কথা বলো। তুমি কিন্তু ঠিক আগের মতোই আছো। শুধু একটু মোটা হয়ে গেছ। এই শৈল শহরে তোমরা নিশ্চয় বেড়াতে এসেছো। কোন হোটেলে উঠেছো? তোমার ফ্যামিলি কোথায়, তাঁরা কি সবাই হোটেলেই আছেন?' একটু থেমে বললেন, 'একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে, তুমি কী করে জানলে আমি এই জায়গায় আর এই বাংলোতে থাকি। এই দেখ, আমি নিজেই বকবক করে চলেছি। এবার তোমার কথা বল। তোমার সঙ্গে আমার কতদিন পরে দেখা .....'

মেঘমালা আস্তে আস্তে মাথা তুলে সরাসরি অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, অনেকদিন পর। তোমার সঙ্গে আমার প্রায় দীর্ঘ ২৬ বছর পর দেখা।' একটা অজানা ছোট হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার কথা বলার স্টাইলটা ঠিক সেই আগের মতোই আছে। আগে খুব সিগারেট খেতে, এখন দেখছি চুরুট খাচ্ছ। আর চেহারাটা তোমার আগের তুলনায় একটু ভারিক্কি হয়েছে।' তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'আমি এখানে এসেছি আমাদের কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে এক শিক্ষামূলক

ভ্রমণে। আর আমার ফ্যামিলি! আসলে আমার জীবনে বিয়ের পিঁড়িতে বসা হয়নি, বলতে পার আমি ইচ্ছে করেই বিয়েটা করিনি। আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তিনি হলেন 'প্রমীলা দি'। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল। প্রমীলাদিও বিয়ে করেননি। সিঁথির মোড়ে প্রমীলাদির ফ্ল্যাটে আমরা দু'জন একসঙ্গে থাকি। প্রমীলাদি আমার দিদি, আমার গর্ডিয়ান, উনি আমার সবকিছু।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'আজ বিকেলে হঠাৎ করেই তোমাকে আমি দুর থেকে দেখেই চিনতে পারি। আমি কল্পনাই করতে পারিনি তোমাকে এখানে এইভাবে দেখতে পাব। আজ তুমি যখন আমাদের কলেজের ছাত্রীদের সামনে শিক্ষামূলক ভ্রমণকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের অজানা তথ্যগুলি সুন্দরভাবে বলছিলে, তখনই খুব ইচ্ছে হয়েছিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আমি পারিনি। এত বছর পর, অত লোকজনের সামনে যদি আমাকে চিনতে না পার, বা চিনলেও তোমার প্রতি একসময় আমার বাবা, মা যে দুর্ব্যবহার করেছিল, সেটা যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, সেই ভয়ে।'

মেঘমালা সজল চোখে বলল, 'কিন্তু, তুমি বিশ্বাস কর, আমি মনের থেকে বলছি, সেদিন তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় কোনও ভেজাল ছিল না। প্রমীলাদি আমার জীবনের সব কিছুই জানে। আর জানে বলেই আমাকে একরকম জোর করেই তোমার কাছে নিয়ে এসেছে তোমাকে সেদিনের প্রকৃত ঘটনাটা জানাবার জন্য। তুমি হয়ত আমাকে ভুল বুঝে অভিমান করে থাকতে পার।'

মেঘমালা চোখের জল মুছে নিয়ে পরিবেশকে হালকা করবার জন্য অনির্বাণকে বলল, 'এবার তোমার কথা বল। বাড়িতে তো অন্য কাউকে দেখছি না! তোমার স্ত্রী, সন্তান তারা কোথায়? তারা কি সব কলকাতায় গেছে? অনির্বাণ হেসে বলল, 'এই দেখ, কথাবার্তায় আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাদের এখনও কফি খাওয়ানো

হয়নি।' ধনঞ্জয়কে ডেকে কফি করতে বললেন। মেঘমালাকে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ধনঞ্জয়ই আমার আপন লোক, আমাকে খুব ভালবাসে আর দেখাশুনা করে। আসলে কি জান, অনেক ভাবনা চিন্তা করেই বিয়েটা আমি আর করতে পারলাম না।'

..... বিয়ের কথাটা সরাসরি মেঘমালার বাবা, মাকে বলতে, তাঁরা অনির্বাণকে বললেন, 'তোমার সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। সামান্য কটা প্রাইভেট টিউশানি করে তুমি আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ!' অনির্বাণ ঠান্ডা মাথায় বোঝাল, 'আমি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট সার্ভিসের চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি, আশা করি চাকরি পেয়েও যাব। আপনারা আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন।' মেঘমালার বাবা, মা অনির্বাণকে চূড়ান্ত অপমান করে বললেন, 'কোনওদিন যেন তোমাকে আমাদের বাড়িতে আর না দেখি। আশা করি, মেঘমালার সঙ্গে তুমি আর কোনওদিন যোগাযোগ রাখবে না। আর একটা কথা শুনে রাখ, আমরা মেঘমালার বিয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছি।' এরপর একরকম অনির্বাণের ইচ্ছেতেই, যদি একই পাড়াতে থাকার দরুন মেঘমালার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে তার বাবা-মা অনির্বাণকে নিয়ে এই পাড়া ছেড়ে কলকাতার অন্য এক জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যায় ।

মেঘমালার তার বাবা মার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করার কোনও রকম ইচ্ছেই ছিল না। সে তার বাবা মাকে বারবার বোঝাতে চেয়েছে সে অনির্বাণকে ভালবাসে। আর অনির্বাণ চাকরি পেলে সে তাকেই বিয়ে করবে আর আশা করা যাচ্ছে সে ভাল চাকরী পেয়েও যাবে। ততদিন যেন বাবা মা অপেক্ষা করে। কিন্তু তাঁরা সেদিন মেঘমালার কোনও কথাই শুনতে চাননি। এরপর বিয়ের কিছুদিন আগে মেঘমালা জানতে পারে বাবার ঠিক করা সেই পাত্র একটি দুঃশ্চরিত্র, লম্পট আর মাতাল। বাবা-মাকে বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হচ্ছে না দেখে অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু অনির্বাণদের নুতন বাড়ির ঠিকানা তার জানা ছিল না, অগত্যা একরাত্রে বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় প্রমীলাদির বাড়িতে।

এরপর বাবা মা অনেক বলা সত্বেও মেঘমালা আর বিয়ে করতে রাজি হয়নি। প্রমীলাদির সাহায্যে, উৎসাহে আরও পড়াশোনা করে অবশেষে প্রমীলাদির কলেজেই পড়বার সুযোগ পায়।

প্রমীলাদি অনির্বাণকে বললেন, 'মেঘমালা আমার কাছে চলে আসবার কিছুদিন পরেই ওর বাবা, মা মারা যান। তারপর থেকে ও আমার কাছেই থাকে। ওকে আমার বোন বলতে পার। আবার মেয়েও বলতে পার। তোমার সঙ্গে এতদিন পরে মেঘমালার দেখা হয়ে ভালই হল। মেঘমালা এতদিন ধরে তার মনের মধ্যে জমানো কথাগুলি তোমাকে বলতে পেরে বোধহয় কিছুটা হালকা হতে পেরেছে। আমরা

কাল সকাল দশটার মধ্যে বেড়িয়ে পড়ব।'

প্রমীলাদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আসলে মেঘমালা তোমাকে ভীষণ, ভীষণ ভালবাসে। সেটা আমি ওর সঙ্গে এতদিন থেকে বুঝতে পেরেছি। ও তোমাকে পাগলের মত সবসময় খুঁজেছে প্রকৃত ঘটনাটা জানাবার জন্য। আমি ওর মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে একান্ত নিরুপায় হয়ে ওকে এই বলে বুঝিয়েছি, তুই সবসময় অনির্বাণের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছিস? সে হয়তো এখন ঘোরতর সংসারী হয়ে সুখেই আছে।'

অনির্বাণ রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এতগুলি বছর আমি শুধু মেঘমালার কথা ভেবে ভেবে এত বড় বাংলোতে একা একা খুব সুখেই আছি!' অনির্বাণ হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'রাত প্রায় নটা বাজে, এখানকার রাস্তাঘাট রাত্রিবেলা মোটেই ভাল নয়। বিশেষ করে এই সময়টায় বন্য জীবজন্তুর আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আজ আবার ঠান্ডার দাপটটা খুব বেশি। আর তাছাড়া কাল সকালেই আপনারা কলকাতা চলে যাচ্ছেন।' ধনঞ্জয়কে ডেকে বললেন, 'ড্রাইভারকে বল এনাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে।'

সকালবেলা শিক্ষক– শিক্ষিকা, ছাত্রীরা সবাই তৈরি। এখুনি তাদের কলকাতা ফিরে যাওয়ার বাস চলে আসবে। প্রমীলাদি মেঘমালাকে বললেন, 'তুই কাঁদছিস কেন? চোখের জল মোছ। জীবনে পথ চলতে গেলে অনেক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়।' মেঘমালা জল ভরা চোখে বলল, 'সে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না, আমি যে তাকে শুধু একটিবার দেখব বলে অপেক্ষা করে রয়েছি। আর হয়ত তার সঙ্গে আমার কোনদিনও দেখাই হবে না।' হঠাৎ হোটেলের সামনে বন দপ্তরের জিপ গাড়িটা জোরে এসে ব্রেক কসল। জিপ গাড়ি থেকে নেমে এলেন অনির্বাণ মুখার্জি। হাসি মুখে বললেন, 'মেঘমালা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। চলো আমার সঙ্গে তোমার নিজের ঘরে, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে। আজকের এই আনন্দের দিনে যদি আমার বাবা–মা বেঁচে থাকতেন, তাঁরাই তোমাকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসতেন ..... । তবে , আমার এখানকার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব আর বিশেষ করে বাংলোর দাসদাসী, আর্দলি সবাই অধীর আগ্রহে আনন্দ সহকারে তাদের নতুন 'ম্যাডামের' আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। মেঘমালা প্রমীলাদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি কাঁদছ প্রমীলাদি?' প্রমীলাদি চোখের জল মুছে নিয়ে মেঘমালাকে বুকে জড়িয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'এটা আমার আনন্দের অশ্রু। আর তাছাড়া মেয়ে বিয়ের পর স্বামীগৃহে চলে যাওয়ার সময় মা তো কাদঁবেই।'

ঠোঁটে কফি, চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা

নীলাঞ্জন হাজরা

নিঃশব্দেই পেরিয়ে গেছে শতবর্ষ। কেউ জানতেও পারেনি। জানবে কী করে? তখন যে গুরুংবাবুদের ফতোয়ায় পাহাড়ে ওঠাই প্রায় নিষেধ ছিল। পর্যটকের ভীড় থাকলে হয়ত সেলিব্রেশন হত। কিন্তু ফাঁকা পাহাড়ে কে আর সেলিব্রেশন করতে যাবে!

কথা হচ্ছে কেভেন্টার্স রেস্তোরাঁ নিয়ে। হ্যাঁ, দার্জিলিংয়ের সেই কেভেন্টার্স, যার পথ চলা শুরু ১৯০৯ সালে। কেভেন্টার্সের কথা প্রথম বলেছিল সৌম্য। যদি আবার দার্জিলিং যাও, অবশ্যই ক্যাভেন্টার্সে যেও। না গেলে দার্জিলিং যাওয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তার আগে বার তিনেক দার্জিলিংয়ে গিয়েছি। কিন্তু সত্যি বলছি, তার আগে কেভেন্টার্সের কথা কেউ বলেনি। তাই যাওয়াও হয়নি। সেখানে কার পা পড়েনি? সত্যজিৎ রায় থেকে ঋত্বিক ঘটক। অমিতাভ বচ্চন থেকে রাজেশ খান্না। এডমন্ড হিলারি থেকে তেনজিং নোরগে। এতলোক যখন গিয়েছেন, তখন নিশ্চয় দামও আকাশছোঁয়া হবে। সে এক পাঁচতারা এলাহি ব্যবস্থা হবে। ভয়মিশ্রিত একটা রোমাঞ্চ নিয়েই গিয়েছিলাম।

কিন্তু গিয়ে ভুল ভাঙল। খোলা ছাদ, একেবারেই সাদামাটা একটা রেস্তোরাঁ। বলে না দিলে আলাদা করে বোঝার উপায়ও নেই। ম্যাল থেকে একটু নেমে

গেলেই চোখে পড়বে রেস্তোরাঁটা। সেখানকার প্রিয় খাদ্য নাকি চিকেন সসেজ। যারা আসে, এটাই আগে খায়।

আরও নানা রকম আইটেম সাজানো, যেগুলো সচরাচর অন্যান্য জায়গায় পাবেন না। এই ছাদ থেকেই কত ছবির শুটিং হয়েছে। সত্যজিৎ রায় নাকি একটা ব্ল্যাক কফি নিয়ে ওই ছাদে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। পাগলাটে চেহারার ঋত্বিকও এলে উঠতে চাইতেন না। তাকিয়ে থাকতেন ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্নারা যখন এসেছেন, নিরিবিলিতে দেখার তেমন সুযোগ পাননি। ছবি তোলার, সই নেওয়ার ভিড় যেন আড়াল করে দিয়েছে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

এমন অনেক অজানা গল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেভেন্টার্স। বেশ কয়েকবার মালিকানার হাত বদল হয়েছে। এখন যাঁরা দায়িত্বে, তাঁদের সেই গর্ববোধ আছে বলে মনেও হয় না। ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সেই উদ্যোগও নেই। পুরানো সেসব ছবিও সংরক্ষণে নেই। তবু কেভেন্টার্স কেভেন্টার্সই। লোকমুখে মুখে ছড়িয়ে যায় তার মাহাত্ম্য। ভিন দেশিরাও ছুটে আসেন, ভিড় করেন ওই ছাদে। তাঁরা কোন ঐতিহ্যের টানে আসেন, কে জানে!

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

রাতের দিকে ফেসবুক নিষিদ্ধ হোক

অভিজিৎ পাল

ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপকে ঘিরে রোজই কোনও না কোনও অঘটন লেগেই আছে। কখনও ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা। কখনও সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা। নতুন নতুন প্রযুক্তি। দিয়েছে অনেককিছু। কিন্তু কেড়ে নিয়েছে বোধ হয় তার থেকেও বেশি কিছু।

আমার সন্তান সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। পড়ে তো লিখলাম, কতখানি পড়ে, জানি না। কারণ, এখন তাকে আর বই হাতে দেখি না। সারাক্ষণ মোবাইল হাতে কী সব যেন করে চলেছে। জিও সিম হাতে আসার পর থেকে এই নেশা আরও বেড়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। সারাক্ষণ খুটখাট করতেই থাকে। কী করে, জানি না। তবে এটুকু বুঝি, যা করছে, তার সঙ্গে ওর পড়াশোনার কোনও সম্পর্ক নেই।

লকডাউনের পর এটা যেন আরও বেশি করে মান্যতা পেয়ে গেছে। সবাই নাকি অনলাইন পড়াশোনায় ব্যস্ত। বইয়ে নাকি কিছুই থাকে না। সবকিছুই নাকি ওই মোবাইলে আছে। শিক্ষকরা নাকি অনলাইনেই থাকেন। নানা ব্যাপারে পড়ুয়ারা নাকি শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেক বাবা-মা এসব বিশ্বাস করেন। অন্যদের কাছে রীতিমতো বড়াই করে বলেন, তাঁর ছেলে বা মেয়ে অনলাইন ক্লাস করছে। কিন্তু একবার ভেবেও দেখেন না এই প্রজন্মের বড় একটা অংশ কীভাবে বাবা-মার মাথায় টুপি পরাচ্ছে। ওরা কি আমাদেরকে একেবারেই গাধা ভাবে!

মানছি, বয়সটাই খারাপ। এই বয়সেই অনেকে বখে যায়। পরে এই সময়টা আর ফিরে পাওয়া যায় না। ছেলেকে বারবার বুঝিয়েছি। কোনও ফল হয়নি। উল্টে রেগে যায়। দিন দিন প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ওর পড়ায় মন নেই। বাথরুমেও যায় ফোন নিয়ে। খেতে বসে খাওয়ার দিকেও মন থাকে না। এতটাই অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে, এক মু-হূর্তও ফোন ছাড়া থাকতে পারছে না। আমার মতো অনেকের ঘরেই হয়ত এই সমস্যা। যার প্রতিকার কী, জানি না।

বাংলাদেশের একটা খবর পড়ে কিছুটা আশা জেগেছিল। সেখানে নাকি রাত দশটার পর ফেসবুক নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। আপাত ভাবে এটা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ মনে হতে পারে। কিন্তু নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে আমার অন্তত মনে হয়, আমাদের দেশেও এই দাবি ওঠা উচিত। ছোট্ট একটা দেশ। নিজের মাতৃভাষাকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে। মাতৃভাষাকে ভালবাসে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাদের পথ দেখায়।

আমাদের দেশেও তো সেই এক সমস্যা। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। অহেতুক রাত জাগছে। নিষিদ্ধ সম্পর্কে আসক্তি আসছে। কর্মসংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে। যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না? তাই, আমাদের দেশেও এই নিয়ম চালু হোক। রাত বারোটা নয়, রাত দশটা থেকে ফেসবুকের উৎপাত বন্ধ হোক।

জানি, অনেকের আপত্তি থাকবে। তাদের হয়ত কিছুটা অসুবিধাও হবে। কিন্তু বিরাট অংশের ছাত্র-যুবকে বাঁচানোর এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। চোখের সামনে আস্ত একটা প্রজন্ম কেমন তলিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু দেখেও, সবকিছু জেনেও আমরা কেমন উদাসীন হয়ে আছি।

বন্ধুত্বের ফাঁদ

ঢোকা সহজ বেরিয়ে আসা বড্ড কঠিন

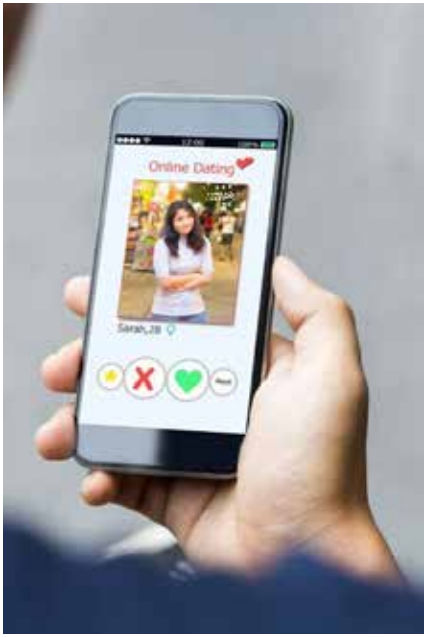

কাগজে বন্ধুত্বের নানা লোভনীয় বিজ্ঞাপন। তার আড়ালে আসলে কী ? জানতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে এলেন। অনেক অজানা কথা লিখলেন সংহিতা বারুই।

কেউ স্কুলের বন্ধু, কেউ পাড়ার। কেউ কলেজের তো কেউ টিউশনির। বর্তমানে তো ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ আর কত কিছুর মাধ্যমে বন্ধুত্বের পরিসর বেড়ে চলছে। চাকরিতে ঢুকলে অফিসে একদল বন্ধু। ডেলি প্যাসেঞ্জার হলে ট্রেনে বাসেও বন্ধু জুটে যায়। জীবনের নানা বাঁকে কত বন্ধু আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তবু আমাদের মন ভরে না। আমরা নিত্য নতুন বন্ধু খুঁজতে ব্যস্ত থাকি।

এক সময় পত্রমিতালির খুব চল ছিল। চিঠি লিখে কত অজানা বন্ধু পাওয়া যেত। তারপর এল নেট। অর্কুট, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ- মজে গেল এই প্রজন্ম। হারিয়ে যাওয়া কত বন্ধুত্বের হদিশ দিল এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। অফিসের কাজ চুলোয়। বাড়ির ফিরেও নেট মুখো। কেউ কেউ সামনে মোবাইল খচখচ করে চলেছে। সবাই ব্যস্ত বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নিতে।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকা নয়। বন্ধুত্ব আরও এক নতুন চেহারা নিয়ে হাজির। মাঝে মাঝেই কাগজে হয়ত পত্রমিতালির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। না, চিঠি পত্রের কোনও পাঠ নেই। সেসব পাঠ তো কবেই উঠে গেছে। এখন বন্ধুত্ব সরাসরি হাজির শরীরের হাতছানি নিয়ে। কোনও লুকোছাপাও নেই। একেবারে সোজাসাপটা চলছে বন্ধুত্বের নামে শরীর দেওয়া নেওয়ার কারবার। কী কী থাকে সেই বিজ্ঞাপনে? আসুন, বয়ানগুলিতে

একবার চোখ বোলানো যাক ।

(১) ঠকবার ভয় নেই, হাই / মিডিয়াম প্রোফাইল বন্ধুর সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ/ ক্লোজ রিলেশনের করুন।

(২) ক্লোজ রিলেশনের মাধ্যমে উপার্জন করে মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন পূরণ করুন।

(৩) আপনি কি নিঃসঙ্গ একাকীত্বে ভুগছেন / প্রকৃত বন্ধুর দ্বারা ভালোবাসা পেতে ও একাকীত্ব দূর করুন। সরাসরি অফিসে আসুন। বিশ্বাস ও গোপনীয়তার সঙ্গে মনের ইচ্ছা পূরণ করে বন্ধুত্ব করুন। সব জেলায় সঠিক পরিষেবা। ইনকামের গ্যারান্টি। স্পেশাল অফার চলছে।

(৪) স্পর্শ, বন্ধুত্বের ছোঁয়া। চাহিদামতো পরিষেবা। খোলা মনে বন্ধুত্বের সম্পর্কের জন্য।

(৫) জীবনের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব দূর করতে ফোন করুন।

(৬) সুইট ফ্রেন্ড । সত্যিকারের বন্ধুত্ব এবং রঙিন সম্পর্কের একমাত্র ঠিকানা। প্রতিটি জেলায় সার্ভিস।

এমন আরও নানা বয়ান। সঙ্গে ফোন নম্বর। বিজ্ঞাপনের ভাষা যাই হোক, সঠিক পরিষেবা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তা সবাই বোঝে। তবু মনে হল, একটু যাচাই করেই দেখা যাক। যোগাযোগ করলাম ধর্মতলা চত্বরের এমন একটি সংস্থার সঙ্গে। মহিলা শুনেই উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। জানিয়ে দিলেন, আপনার কোনও খরচ লাগবে না। কোনও রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না। বরং বাড়তি কিছু আয় করতে পারেন। আপনার জীবন বদলে যাবে। চলে আসুন। কিছুটা দ্বিধা ছিল। ভয়ও ছিল। তবু গেলাম। একজন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। সে ভাল করে দেখে নিল। তারপর নিয়ে গেল একটা গলির ভেতর।

ছোট্ট একটা অফিস। এক মহিলা সেখানে বসে। বেশ সুন্দরীই বলা যায়। কথা বার্তাও বেশ গোছানো। জানতে চাইলেন, কেন বন্ধু খুঁজছি। কী বলব, মোটামুটি তৈরি হয়েই গিয়েছিলাম। বললাম, আরও কিছু উপার্জন করতে চাই। এবার সেই মহিলা বুঝিয়ে দিল কী কী করতে হবে। প্রথমেই একটি ফর্ম ফিলাপ। সেখানে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখতে হবে। লিখতে হবে বয়স, ওজন, উচ্চতা। জমা দিতে হবে ছবি। আমি অবশ্য ছবি জমা দিইনি। তবে যে ঠিকানা দিয়েছিলাম পুরোটাই ভুল। সেই মহিলা বলল, বাড়ির অনুমতি আছে তো! আমি বললাম, এসব কাজ কি কেউ বাড়িতে জিজ্ঞেস করে নাকি? আপনিই কি বাড়িতে সত্যি কথা বলে এই চাকরিটা করতে এসেছিলেন? তখন সেই মহিলা আরও প্রশ্ন করতে লাগল। আগে কখনও শারীরিকভাবে কারও সঙ্গে মিলিত হয়েছি কিনা, বাইরে যেতে আপত্তি আছে কিনা। বানিয়ে বানিয়ে যা যা বলার বললাম।

কী রকম টাকা পাওয়া যেতে পারে? কীভাবে কাজ হয়? কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। কারা নেই এই তালিকায়? কলেজে ছাত্রী থেকে গৃহবধূ, ডাক্তার থেকে শিক্ষিকা, বিধবা থেকে ডিভোর্সি। শারীরিক তৃপ্তিও হল, আবার বাড়তি উপার্জনও হয়ে গেল। অভাবের তাড়নায় নাম লেখাচ্ছে, এমন সংখ্যাও কম নয়। আর পুরুষদের মধ্যে! সেখানে উচ্চ পদস্থ আমলা থেকে সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী থেকে প্রমোটার। পুলিশি ঝামেলা? ওই সংস্থাই আপনাকে আশ্বস্ত করবে, ওসব ভয় পাবেন না। আমরা নানা জায়গায় মাসোহারা দিই। কিচ্ছু হবে না।

মূলত, টাকা আদায় হয় ছেলেদের কাছ থেকেই। কেউ যে নির্ভেজাল বন্ধুত্বের জন্য ফোন করেছে না, এটা সবাই বোঝে। শুধু দেখে নেওয়া হয়, কার সামর্থ্য কেমন। যেমন টাকা ফেলবেন, তেমন সুন্দরী পাবেন। প্রথমেই নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার জন্য কোথাও লাগে ২ হাজার টাকা, কোথাও চার হাজার। এরপর দফায় দফায় 'পরিষেবার'র জন্য আলাদা খরচ তো আছেই। জানতে চাওয়া হবে, কী রকম বন্ধু তাঁর পছন্দ। কলেজ ছাত্রী নাকি গৃহবধূ, স্লিম নাকি মোটা, সবরকম ব্যবস্থাই আছে। দেখানো হবে ক্যাটালগ। কার কী রেট, তাও জানিয়ে দেওয়া হবে। রেটে পোষালে ভাল, নইলে কম রেটে চেষ্টা করুন। কোথাও কোথাও দরাদরি, আবার কোথাও ফিক্সড রেট। সবকিছু বোঝা হল।

এখানেও নানা প্যাকেজ। কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্নিধ্য চান, নাকি সারাদিনের জন্য নিয়ে যেতে চান? দিন পাঁচেকের জন্য বাইরে নিয়ে যেতে চান? সব রকম ব্যবস্থাই আছে। খরচ? দিন পিছু কুড়ি হাজার থেকে এক লাখ। তার একটা অংশ পায় ওই বন্ধুত্ব কারি সংস্থা, আর একটি অংশ সেই নাম লেখানো মহিলা। একবার নাম লেখালে আর নিস্তার নেই। ওই সংস্থার কথাই আপনাকে শুনে চলতে হবে। কখন কোন ক্লায়েন্টের কাছে যেতে হবে, তা ওই সংস্থাই বলে দেবে। বাড়িতে বা পাড়ার মোড়ে গাড়ি গিয়ে তুলে আনবে। আবার ছেড়েও আসবে। তাদের কথা মতো চললে সমস্যা নেই। কিন্তু না শুনলেই নেমে আসবে নানা বিপর্যয়। আপনার বাড়ির ঠিকানা তো জানাই আছে। আপনি হয়ত শুধু নিজের নম্বর টুকুই জানিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাবা বা স্বামীর নম্বর তাদের কাছে ঠিক পৌঁছে গেছে। কীভাবে জোগাড় করে, তারাই জানে। হোটেলে বা অন্য কোথাও কখন যে আপনি ক্যামেরা বন্দি হয়ে গেছেন, আপনি নিজেও জানেন না। সেই সব গোপন মুহূর্তের ছবি সযত্নে সামলে রাখে এই সংস্থা গুলি। যখনই আপনি তাদের কথার খেলাপ করবেন, তখনই আস্তে আস্তে ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হবেন। আপনার স্বামীর মোবাইলে হয়ত ফোন আসবে। কেউ হয়ত বাড়িতে ডাকতেও চলে আসবে। তাতেও কাজ না হলে এম এম এস করে সেসব ছবি নানা জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার হুমকিও থাকবে। অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছেয় নাম লেখানো যায়, কিন্তু বেরিয়ে আসার রাস্তাটা আপনার জানা নেই।

এমন অনেক মহিলাই আছে, যারা বিয়ের আগে কিছু প্রলোভনে হয়ত নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর, ইচ্ছা না থাকলেও তাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। এমনকি গর্ভবতী অবস্থাতেও আপনার ছাড় নেই। তখনও ছুটতে হবে গ্রাহককে 'পরিষেবা' দিতে। চাইলেও বেরিয়ে আসার উপায় নেই। শোনা যায়, এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে না পেরে দু–একজন আত্মহত্যাও করেছে। আরও যেসব তথ্য বেরিয়ে এল তা মারাত্মক। শালীনতার কারণে সেগুলো লেখা উচিত হবে না। সবকিছু এত খোলামেলা। সব কিছুই হচ্ছে একেবারে প্রকাশ্যে, দিনের বেলায়। সব আর্থিক লেনদেন হয় প্রথম সারির রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। অথচ কারও কিছু করার নেই! কেউ কেউ বিজ্ঞাপনে দাবি করে সরকারি স্বীকৃত। চোখের সামনে কর্পোরেট কায়দায় অবাধে চলছে দেহ ব্যবসার র‍্যাকেট। কাগজে থাকছে ঢালাও বিজ্ঞাপন। কোনও কিছুই পুলিসের নজরে পড়ছে না! মাঝে মাঝে একবার মধুচক্রে হানা! ব্যাস, এখানেই দায়িত্ব শেষ। সেই ট্রাডিশন চলতেই থাকে।

‘প্রচলিত’ গানের আড়ালে

মুকেশ সিংহ

সেই ক্যাসেটের যুগ হারিয়ে গেছে। এমনকী সিডিও আজকাল আর তেমন দেখা যায় না। নেই সেই ইনলে কার্ড। তাই কোন গানটা কার লেখা, কার সুর— এই তথ্যগুলোও আস্তে আস্তে কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ইউটিউবে গান থাকে। একই গান নানা কণ্ঠেও থাকে। কিন্তু কার লেখা, কার সুর এই তথ্যগুলো অনেক জায়গায় সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমনকী কোনও গান রিমেক হলে আগে কে রেকর্ড করেছিলেন, এই তথ্যটাও থাকে না। তাই অনেক গানের ইতিহাস বেমালুম হারিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, একজন শিল্পী একটা গান কেন রিমেক করেন? ধরে নেওয়াই যায়, সেই গানটা তিনি ছোট থেকে শুনে আসছেন। তাঁর মনের মধ্যে সেই গান স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। সেই কারণেই এত গান থাকতে সেই গানকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই গান রেকর্ডের সময় তার কথা ও সুর কার, সেই ব্যাপারটি গায়ক জানেন না। এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

অথচ, ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। ভূমি ব্যান্ডের একটি বিখ্যাত গান— লালপাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা। ইথাই তুকে মানাইছে নাই রে, এক্কেবারে মানাইছএ নাই রে। যাঁরা গান বাজনার একটু হলেও খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন, গানটি কবি অরুণ চক্রবর্তীর লেখা। গানটি প্রথম গেয়েছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। কিন্তু এই ইতিহাস বেমালুম চেপে যাওয়া হল ভূমির সেই ক্যাসেটে। গানের কথা ও সুরের জায়গায় লিখে দেওয়া হল প্রচলিত। সত্যিই কি জানতেন না? নাকি ইচ্ছে করে ইতিহাসটাকে চেপে যেতে চেয়েছিলেন? এই বছর হল সেই কবিতার পঞ্চাশ বছর। তাই এই গানটিকে ঘিরে বিতর্ক আরও বেশি করে সামনে আসছে।

এমন প্রচলিত শব্দের আড়ালে কত গানই না থেকে গেছে। কোথাও না জানার কারণে। আবার কোথাও সচেতন ভাবে প্রচলতি শব্দের আশ্রয় নেওয়া। আবার এমন অনেক গানও আছে, যাকে আমরা অন্যভাবে চিনি। অন্য কারও গান বলে জানি। অথচ, আসল শ্রদ্ধা হয়ত অন্য কেউ। মূলত লোক গানের ক্ষেত্রেই এই বিতর্কটা আরও বেশি করে দেখা দেয়। এমন অনেক বাউল গান আছে, যার সঠিক স্রষ্টার হদিশ পাওয়া যায় না। কোনওটা চলে লালনের নামে। কোনওটা আবার প্রচলিত বলে চালানো হয়। আবার অনেক পুরনো

গানও সেই বাউল শিল্পীদের নামেই পরিচিত। যেমন, বড়লোকের বিটি লো। গানটি স্বপ্না চক্রবর্তীর কণ্ঠে একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে ব্যান্ডের দৌলতে আরও বেশি প্রচার পায়। কিন্তু আসল শিল্পী রতন কাহার আড়ালেই থেকে যান। অনেক পরে জানা গেল, এটি রতন কাহারের গান।

গঙ্গা ছবির একটি বিখ্যাত গান। আমায় ভাসাইলি রে। ছবির সঙ্গীপ পরিচালক সলিল চৌধুরি। একটি দৃশ্যের সঙ্গে গানটি মানানসই হবে ভেবে গানটি ব্যবহার করা হয়। গেয়েছিলেন মান্না দে। এটি মান্না দের গান বলেই পরিচিত। কিন্তু এই গানটির আসল রচয়িতা পল্লীকবি জসীমুদ্দিন। নন্দলাল ও দেবদুলালের লোকগান। স্বপন বসুর কণ্ঠে গানটা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু এই গান আসলে সলিল চৌধুরির লেখা ও সুর। আরও এক বিখ্যাত গান— একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। অনেকের ধারণা, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ক্ষুদিরাম বসু বোধ হয় এই গান গেয়েছিলেন। বেশ কিছু পুতুল নাচ বা যাত্রায় এইভাবেই দেখানো হয়েছে। অথচ, এমন কোনও ক্ষুদিরাম গাওয়া তো দূরের কথা, নিজের জীবদ্দশায় এমন কোনও গানের কথা শুনেও যাননি। শোনা যায়, বাঁকুড়ার কবি পীতাম্বর দাস এরকম একটি গান বেঁধে পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। সেই গানটিই লতা মঙ্গেশকারকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল সুভাষচন্দ্র ছবিতে। যেখানে বালক সুভাষচন্দ্র সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। এক প্রবীণ বাউল তাঁর কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন সেই কিশোরী সেই গান গাইছে। ছবির টাইটেল কার্ডে গানটি প্রচলিত বলেই উল্লেখ আছে।

আবার এমন অনেক গান আছে, যা কোনও বিখ্যাত গায়কের গান হিসেবে পরিচিত। কিন্তু গানটি আসলে অন্য কোনও বিখ্যাত গায়কের। যেমন, কী আশায় বাঁধি খেলাঘর। এক বাক্যে সবাই বলবেন, এটি কিশোর কুমারের গান। কিন্তু এটি আসলে শ্যামল মিত্রর গান। পাঁচের দশকে আধুনিক গান হিসেবে এটি আকাশবাণীতে রেকর্ড করেন শ্যামল মিত্র। গানটির কথা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের। সুর স্বয়ং শ্যামল মিত্রর। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, গানটি তেমন জনপ্রিয় হয়নি। লোকের কাছে পৌঁছয়নি। প্রায় বছর পনেরো পর। শক্তি সামন্ত তখন অমানুষ ছবি করছেন। সুন্দরবনের পটভূমিতে ছবি। নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে একটি বিষাদমাখানো গান। রাত শেষে ভোর হয়ে আসছে। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী গান লিখতে বসলেন গৌরীপ্রসন্ন। সুর দেওয়ার কথা শ্যামল মিত্রর। কিন্তু কোনও গানই পরিচালকের পছন্দ হচ্ছে না। এমনকী গীতিকার বা সুরকার নিজেরাও সন্তুষ্ট নন। তাহলে উপায়? তখন দুজনেরই মনে পড়ল সেই পুরনো রেকর্ড করা গানটা। শ্যামল মিত্র গেয়ে শোনালেন। পরিচালকের বেশ পছন্দ। সেই গানই রাখা হল সিনেমায়। কিশোর শুরুতে বলেছিলেন, এটা আপনার গান, আপনিই গান। কিন্তু শ্যামল বললেন, আমার গলায় তো মানুষ নেয়নি। তার থেকে বরং তুমি গাও। তোমার গলয়া হয়ত গানটা নতুন করে বেঁচে উঠবে।

বাকিটা তো ইতাহাস। এভাবেই এক গান বেঁচে থাকে অন্য কোনও পরিচিতির আড়ালে। এক স্রষ্টা থেকে যান অন্য কোনও স্রষ্টার আড়ালে।

নীল সাহেবের কুঠি

শাশ্বত মজুমদার

পয়লা বৈশাখে ঘুরে এলাম ভাল ভূতের দেশ। জায়গাটার নাম মঙ্গলগঞ্জ। নিউ টাউনে আমার ফ্ল্যাট থেকে ৯৩ কিমি। সেলফ ড্রাইভ অবশ্যই। সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম, ঘণ্টা আড়াই লাগল পৌঁছতে। হাবড়া, ঠাকুর নগর, চাঁদ পাড়া হয়ে যাওয়া যায়। আমরা গিয়েছিলাম বারাসাত, হরিণ ঘাটা, চাকদা হয়ে। রাস্তা মোটামুটি, খুব ভাল বলা যাবে না।

মাঝে কোনও ব্রেক ছিল না। মঙ্গলগঞ্জ পৌঁছে গেলাম ১০ টা নাগাদ। ব্যাকপ্যাকার্স ক্যাম্পে ঢোকার রাস্তা বেশ সরু, আলপথ বলা যেতে পারে। একটু বড় গাড়ি হলে অসুবিধে হতে পারে।

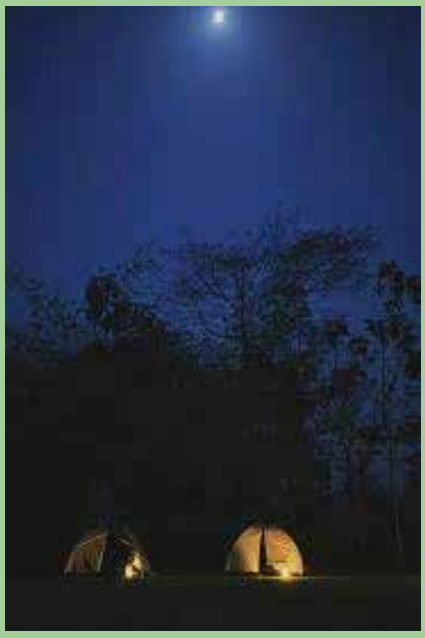

ক্যাম্পের গেট টাও বেশ সরু, বড় গাড়ি হলে একটু অসুবিধে বইকি। তবে ক্যাম্পের জায়গাটা কিন্তু অসাধারণ।

একদিকে টেন্ট আর একদিকে বাম্বু কটেজ। আমরা কটেজ নিয়েছিলাম। মাঝে একটা সুন্দর বড় লন। গাছপালা ভর্তি। ওখানে আলাপ হল পুষ্পার সঙ্গে। পুষ্পার চোখ দুটো অসাধারণ। একবার তাকালে ফেরানো মুশকিল। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম ডিঙ্ক। গরম প্রচণ্ড ছিল, অনেক আরাম পেলাম। ব্রেকফাস্টের পর ওখানকার অ্যাটেন্ডেন্টদের সঙ্গে শুরু হল গল্প। এই জায়গায় ছিল নীল সাহেবদের কুঠি, এখানেই হত নীল চাষ। চাষিদের জোর করে নীল চাষ করাতো ইংরেজরা। আর সেই নীল বিদেশে এক্সপোর্ট হত। এক নীল সাহেবকে এক দিন গলা কেটে মেরে ফেলে চাষিরা। সেই থেকে ওই নীল সাহেবের অতৃপ্ত আত্মা নাকি ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

সেই নীল সাহেবের কুঠি ক্যাম্প থেকে খুব একটা দূরে নয়। দুপুরে লাঞ্চ করলাম, একদম বাড়ির মতোই খাবার— ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ, চাটনি। সাদা সাপটা খাবার কিন্তু খুব সুন্দর স্বাদ। খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে। নীল সাহেবের কুঠি পার হয়েই ইছামতী নদী, হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। দিনের আলোয় কুঠি দেখে কিন্তু ভয় লাগল না। উল্টে পুরো ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। পুরনো কনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে পড়েছে, ভাঙ্গা সিড়ি, ভগ্নপ্রায় বারান্দা, অনেক ছবিতে তুললাম স্বামী স্ত্রী বাচ্চা মিলে।তারপর গেলাম নদীর দিকে।ওখানে নৌকো বিহারের লোভ সামলাতে পারলাম না। দু ঘণ্টা নৌকো করে নদীতে ঘুরলাম। নদীর ওপাশে পারমাদান অভয়ারণ্য। সন্ধ্যে হয়ে গেছিলো বলে আর যাওয়া হয়নি। যাই হোক, নৌকো বিহার করে পাড়ে উঠে পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরে, চা বিস্কুট খেয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্প। ফেরার পথে একটা গ্রামের দোকানে বসে কিছুক্ষণ গপ্পো করলাম দোকানের মালকিনের সঙ্গে। ক্যাম্পে ফিরে বড়সড় চমক ছিল। দুর্দান্ত bar b q এর প্ল্যান হল। ক্যাম্পে ছিল আমাদের মতই আর একটা ফ্যামিলি, আর একটা জনা আটেক কলেজ পড়ুয়া ছেলের গ্রুপ। Bar b q শেষ হওয়ার পর ছিল আসল সারপ্রাইজ। ওখানকার একজন attendant প্রস্তাব দিল আমাদের অন্ধকারে নীল কুঠির দিকে যাওয়ার জন্যে। সামনে ও যাবে হ্যারিকেন নিয়ে, আর পেছনে আমরা সবাই, ওই ১২/১৪ জন।সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।বলে

বোঝানো যাবেনা, গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো।

অনেক রকম ভূত আর অশরীরীর গল্প শুনলাম। তার পর হাঁটতে হাঁটতে ইছামতী নদী, উফ্, সে এক এক্সপেরিয়েন্স। নদীর ঘাটে সিড়িতে বসে সবাই যে যার নিজের ভৌতিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করল। এসবের মধ্যেই ঘাটের সিড়িতে হঠাৎ আর একটা যে ফ্যামিলি ছিল, ভদ্রলোকের স্ত্রী পড়ে গেলেন হোঁচট খেয়ে। পায়ের আঙুল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। তাঁর মনে হয়েছে কেউ নাকি ওনাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে। যাই হোক, সবাই বেশ ভয় পেয়েছিল সে রাতে, ফিরে এলাম ক্যাম্পে। এসে ডিনার সারলাম রুটি/ভাত চিকেন। অসামান্য টেস্ট, এখনও মুখে লেগে আছে। ছেলেদের গ্রুপটা পার্টি করছিল, গিটার বাজিয়ে গান করছিল, বেশ ভাল লাগছিলো পরিবেশটা। আর একটা যে ফ্যামিলি ছিল, ওদের বছর সাতেকের ছেলের সঙ্গে আমার ছয় বছরের মেয়ের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল, সে দুজনের কি গল্প। এসব করতে করতে রাত হয়ে গেল, ঘুমও পাচ্ছিল।

একটা উৎপাত আছে ওখানে, সেটা হচ্ছে আরশোলা আর মাকড়সা, ঘরের মধ্যে। লাল হিট আর mosquito cream অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। আমাদের গোটা সাতেক আরশোলা মারতে হয়েছিল। মজাটা হচ্ছে, দিনের বেলা যেখানে গরমে টেকা যাচ্ছিল না, সেখানে রাতে লাগছিলো ঠান্ডা। ঘরে একটা সিলিং ফ্যান আর একটা স্ট্যান্ড ফ্যান ছিলো, স্ট্যান্ড ফ্যান টা বন্ধ করে ঘুমোতে হলো। সারা দিনের ক্লান্তি ছিল, ঘুমিয়েও পড়লাম। পর দিন সকালে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতার উদ্দ্যেশ্যে। ওখানকার ঘর গুলোর নাম গুলো অদ্ভুত, পেত্নী, ব্রহমদৈত্য,

শাঁখ চুন্নি, ডাইনিং হলের নাম নরখাদক। গুপী বাঘার ভূতের রাজার সঙ্গে selfie মিস করা যাবে না কিন্তু।

সব মিলিয়ে ২২/২৩ ঘণ্টা অসাধারণ কেটেছিল। হয়তো গরম বলে একটু কষ্ট হয়েছে, বর্ষা বা শীত কালে এই জায়গাটার রূপ অসাধারণ হওয়া উচিত, ইচ্ছে আছে শীতকালে আরেক বার ঢু মারার। শহরের কোলাহল, ব্যস্ততা আর ইট কাঠ পাথরের আবর্জনা থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় সবুজের মাঝে হারিয়ে যেতে হলে একবার ঘুরে আসবেন ‘ভালো ভূতের দেশ’ থেকে। মিশকালো অন্ধকারে ইছামতির ওপর শয়ে শয়ে জোনাকির মিটমিটে আলো আর সঙ্গে পূর্ণিমার ঝকঝকে চাঁদ পেলে তো কথাই নেই।

ব্যাকপ্যাকার্স ক্যাম্পকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরম একটা অসাধারণ জায়গা খুঁজে বের করার জন্যে।

এমন একটা লাইব্রেরি হারিয়ে যাবে না তো!

স্বরূপ গোস্বামী

সময়টা ১৯৭৮। একদিন তিনি গিয়েছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। গিয়ে দেখলেন, ডাঁই করে এক জায়গায় জড়ো করা আছে কিছু ছোটখাটো পত্রিকা। এগুলির কী হবে? খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, এইসব পত্রিকা রাখার জায়গা নেই। ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ এগুলিকে রাখতে আগ্রহীও নন। অতএব, এগুলির কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এগুলি ফেলেই দেওয়া হবে।

তখন তিনি সদ্য তরুণ। সবে কলেজের গন্ডি পেরিয়েছেন। নিজেদের উদ্যোগে পত্রিকাও বের করছেন। তাই জানেন, একটা লিটল ম্যাগাজিনের পেছনে কত লড়াই, কত

পরিশ্রম, কত স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে। সেইসব পত্রিকার সম্পাদকরা নিজেদের পত্রিকাগুলিকে পাঠিয়েছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। যদি সংরক্ষিত থাকে! যদি কোনও গবেষকের কোনও কাজে লাগে! যদি কোনও গুণীজনের নজরে পড়ে! কিন্তু এগুলি কিনা ডাস্টবিনে চলে যাবে!

সেদিনের সেই তরুণ ঠিক করলেন, এই পত্রিকাগুলিকে এভাবে বাতিল হতে দেবেন না। নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। ঠিক করলেন নিজেই তৈরি করবেন একটা লাইব্রেরি। নাম দিলেন কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে শুরু হল পথচলা। এবার নিজেই শুরু করলেন লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ। বিভিন্ন দোকান থেকে কোনওটা কিনলেন। কোনওটার গ্রাহক হলেন। কোনওটা বিভিন্ন বন্ধু মারফত আনিয়ে নিলেন। আবার কোনও কোনও সম্পাদক ততদিনে জেনে গেছেন, ট্যামার লেনে এই ম্যাগাজিনগুলি পরম যত্নে সংগ্রহ করে রাখা হয়। তখন তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পাঠাতে লাগলেন তাঁদের পত্রিকা।

এভাবেই সংগ্রহ ক্রমশ বাড়তে লাগল। হাতে আসতে লাগল দুষ্প্রাপ্য সব বই ও পত্রিকা। আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেলেন এই লাইব্রেরির সঙ্গে। সন্দীপ দত্ত নামটা হয়ে উঠল লিটল ম্যাগাজিনের দুনিয়ায় খুব পরিচিত একটা নাম। দেশ–বিদেশের গবেষকরা কী করে যে সন্ধান পেয়ে যান! ছুটে আসেন ট্যামার লেনের এই ছোট্ট লাইব্রেরিতে।

এত এত লাইব্রেরি থাকতে তাঁর লাইব্রেরিতে কেন আসতেন? ১) এখানে এলে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া যাবে। যা

আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। ২) বড় লাইব্রেরি মানে বড় বাজেটের বাণিজ্যিক বই। তাতে সবার খিদে নাও মিটতে পারে। ৩) সন্দীপ দত্ত নিজে একজন চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। কোন বিষয়টা কোন বইয়ে পাওয়া যাবে, তিনি ঠিক খুঁজে বের করে দেবেন। এই সুবিধা অন্য লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে? ৪) ধরা যাক, আপনি ভাদু বা টুসু গান নিয়ে কিছু খুঁজছেন। সন্দীপ দত্তকে একবার বললেই হল। তিনি আপনার হাতের সামনে কুড়ি রকমের রেফারেন্স বের করে দেবেন। কোনও পত্রিকা হয়ত সাতাশ বছর আগে পুরুলিয়ার কোনও অখ্যাত গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কোনওটা হয়ত কোনও লোকসংস্কৃতির গবেষকের বই। এমন সব বই যা হয়ত স্বয়ং লেখকের পরিবারের লোকের কাছেও পাওয়া যাবে না। ধরা যাক, আপনি বীরভূমের কোনও এক লেখকের কয়েকটা গল্পের সন্ধান করছেন। কিন্তু সেইসব গল্প বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উদ্ধার করতে পারেন একজন, তাঁর নাম সন্দীপ দত্ত।

প্রায় ৪৫ বছর ধরে সযত্নে আগলে রেখেছিলেন এই লাইব্রেরি। কত হাজার হাজার গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন এই লাইব্রেরির সাহায্য নিয়ে। কত হাজার হাজার বইয়ের আতুরঘর হল এই লাইব্রেরি। কত লেখককে তাঁদের হারানো লেখা খুঁজে দিয়েছে এই লাইব্রেরি। কিন্তু মানুষটি প্রচারের আড়ালেই থেকে গেলেন। না পেলেন সরকারি অনুদান। না পেলেন সরকারি স্বীকৃতি। অবশ্য সেসবের প্রত্যাশীও ছিলেন না। কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই বলতেন, 'যাঁরা সরকার চালান, তাঁরা কি এসবের মর্ম বুঝবেন? তাঁদের কত কাজ! কত ক্লাবে টাকা দিতে হয়! তাঁরা খামোকা এইসব লাইব্রেরিকে টাকা দিতে যাবেন কেন?' কিন্তু আপনার অবর্তমানে এই লাইব্রেরির কী হবে? এই প্রশ্নটা বারেবারেই শুনতে হয়েছে। নিজেও কি ভাবেননি? নিশ্চিতভাবেই এই ভাবনাটা আজীবন তাঁকেও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কখনও বলেছেন, 'যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাই বাঁচিয়ে রাখবেন।' আবার কখনও আক্ষেপ নিয়ে বলেছেন, 'এরপর একদিন আপনি বেল বাজাবেন। কিন্তু দরজা খুলবে না।'

নিশ্চিতভাবেই এই লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের নস্টালজিয়ায়, কৃতজ্ঞতায় হয়ত থেকে যাবে এই লাইব্রেরির কথা। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসা এক জিনিস আর তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখা আরেক জিনিস। যে দরদ নিয়ে সন্দীপ দত্ত এই লাইব্রেরিকে আগলে রাখতেন, সেই দরদ কি অন্য কারও মধ্যে দেখা যাবে? তিনি যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন, দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকার খবর রাখতেন, কোথায় কী মণিমুক্তো আছে, তার সন্ধান জানতেন, সেটা কি আর

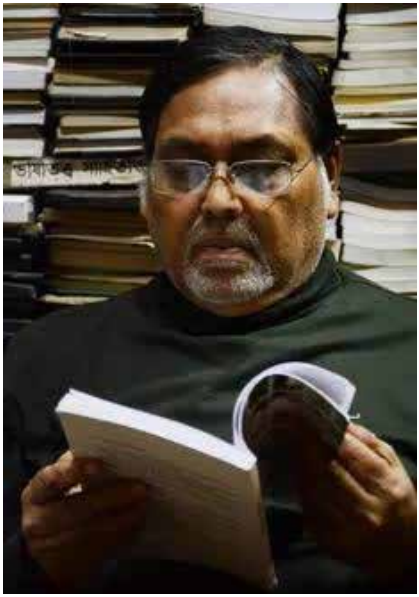

কারও পক্ষে জানা সম্ভব? বই হয়ত থাকবে, কিন্তু এভাবে কোন তাকে কোনটা আছে, ধুলো ঝেড়ে খুঁজে বের করবেন কে? তাই দুশ্চিন্তা থেকেই যায়।

একজন মানুষ পাঁচ দশক ধরে এমন একটা কাজ করে গেলেন। আমরা কতটুকুই বা খোঁজ রেখেছিলাম! এখন সেলিব্রিটির বৃত্ত থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে এমন সৃষ্টিশীল মানুষদের পদ্মসম্মান দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথা কারও মাথায় এল না! রাজ্য সরকারের নানা 'ভূষণ', 'শ্রী' আছে। যাঁরা নাম বাছাই করেন, তাঁরা কি জানতেন এই সন্দীপ দত্তর কথা! তাঁর এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের কথা! তারপরেও তাঁর নাম বিবেচনায় এল না!

ভয় হয়, এমন সুন্দর একটা লাইব্রেরি, কালের গর্ভে তলিয়ে যাবে না তো? যদি সত্যি এমন পরিণতি হয়, সেটা কতবড় ক্ষতি, তা বোঝার মতো সংবেদনশীল মন সত্যিই কি আমাদের আছে?

ব্যাট হাতে মাঠে যখন খেলতে নামেন ভিভ..

অজয় নন্দী

ক্রিকেটে আমার প্রিয় দল কোনটি? নিশ্চিতভাবেই ভারত। কিন্তু আটের দশকে যদি কেউ এই প্রশ্নটা করত, হয়ত একটা অন্যরকম উত্তর দিতাম। কারণ, তখন আমি ভারতের জয় যত না চাইতাম, তার থেকে বেশি চাইতাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়।

পচাত্তর বা উনআশির বিশ্বকাপ দেখার সুযোগ হয়নি। এমনকী তিরাশিতেও না। কিন্তু তারপর থেকেই একটু একটু করে ক্রিকেট বোঝা। ততদিনে জেনেছি, প্রথম দুবার এই দলটিই বিশ্বকাপ জিতেছে। তিরাশিতে এই ক্যারিবিয়ানদের হারিয়েই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত।

কলকাতার জীবন আর মফস্বল জীবনে তখন ঢের ফারাক। কলকাতা যখন তিরাশির বিশ্বকাপের স্মৃতির ঢেঁকুর তোলে, মফস্বল সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে। তিরাশিতে অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎটুকুও পৌঁছয়নি। যেসব মফস্বল বা আধা শহরে পৌঁছেছে, সেখানেও হাতে গোনা কয়েকটা ঘরে টিভি। তাছাড়া তখনও ক্রিকেটের তেমন চল ছিল না। মফস্বল জীবন তিরাশিকে চিনেছে তিরাশির অনেক পরে। সেই জীবনে বিশ্বকাপের অভিষেক বলতে ছিয়াশির মারাদোনা। আর ক্রিকেটের বিশ্বকাপ বলতে, তার ঠিক এক বছর পর, সাতাশি। সেবার ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ। পাড়ায় পাড়ায় টিভি কেনার ধুম। সেই প্রথম টিভি নামক বস্তুটা উচ্চবিত্তের বেড়া টপকে মধ্যবিত্তের বারান্দায় এসে পড়ল। তবু এক ঘরের বারান্দায় পড়শিদের, বন্ধুদের ভীড়। ছাদে টাঙানো অ্যান্টেনা, হাওয়া দিলেই নড়ে যায়। একজন ছুটল ছাদে, এদিক-ওদিক ঘোরাল। অন্যজন নিচ থেকে চিৎকার করল, ‘আরেকটু, আরেকটু। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।’

সে ছিল এক সাদা-কালো টিভির রঙিন এক ভুবন। সবুজ ঘাস, লাল বল— এসবের আলাদা কোনও অস্তিত্ব ছিল না। টিভির পর্দায় নয়, সব রঙ তখন মনের পর্দায়। ভারত নামে একটা দেশ, যারা আগেরবার বিশ্বকাপ জিতেছে। ওদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দু’বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তিরাশিতে নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে ফিরে এসে রানার্স হয়েছে। এবার নিশ্চয় বদলা নেবে! কিন্তু

সেই লয়েড নেই। হোল্ডিং, গারনার, রবার্টসরা নেই। মার্শালও নাকি চোটের জন্য খেলবেন না। এমনকী গর্ডন গ্রিনিজও নেই। তবু দলটার নাম তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আগেরবার হারের যন্ত্রণা। তারা কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে!

ভারত শুরুই করল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হার দিয়ে। তাও আবার মাত্র এক রানে। ওদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কাকে জাস্ট উড়িয়ে দিল। ভিভ রিচার্ডস কিনা ১৮১ করে দিল! আমাদের কপিলদেবের সাধের ১৭৫ এর রেকর্ড ভেঙে চুরমার। এত নির্দয়ভাবে কেউ মারে! আহা, শ্রীলঙ্কা বলে কি মানুষ নয়! ওরাও তো খেলতে এসেছে। লোকটা মনের সুখে চুইং গাম চিবোচ্ছে, আর দুমদাম ছয় মারছে। আবার ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে চুইং গাম চিবোচ্ছে। কাগজে একটা ছড়া পড়লাম—

‘ব্যাট হাতে মাঠে যখন
খেলতে নামেন ভিভ,
স্বর্গ মর্ত্য কাঁপে তখন
কাঁপেন বাবা শিব।’

ছড়াটা নিমেশে মুখস্থ হয়ে গেল। বহুদিন যেখানে-সেখানে, কারণে-অকারণে আউড়ে ছিলাম। কপিলের রেকর্ড ভেঙে গেল বলে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কেন জানি না, মনে হল, এই রেকর্ডের মুকুট বোধ হয় রিচার্ডসের মাথাতেই মানায়। ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে, চুইং গাম চিবোতে চিবোতে ভিভিয়ান রিচার্ডস। আহা, সে কী রাজকীয় ঔদ্ধত্য। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিলেন। আলতো একটা ছোঁয়া দিলেন। বল যেন ছুটে গেল মাঠের বাইরে। তারপর আবার সেই ব্যাট ঘোরাতে ঘারোতা চুইং গামে মন দেওয়া। যেন কিছুই হয়নি।

তিরাশিতে তাঁর আউটের দৃশ্যটা পরে বারবার দেখেছি। মনে হয়েছে, ভারতের প্রতি যেন কিছুটা করুণাই করলেন। রাজকীয় সংহারের পর যেন একটু আলসেমি। যা, ক্যাচ তুলে দিলাম। পারলে নিয়ে নে। আমরা তো দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছি। এবার অন্য কেউ পেলে পাক। ক্রিকেটের সম্রাট বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে তিনি ভিভ রিচার্ডস। তাঁর থেকে

বেশি রান বা সেঞ্চুরি অনেকেই করেছেন। তাঁর থেকেও কম বলে সেঞ্চুরিও অনেকে করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাউকেই রিচার্ডসের আশেপাশে বসানো যায় না। ভিভ মানেই কৈশোরের সেই মুগ্ধতা। ভিভ মানেই একটা অলস আভিজাত্য। ভিভ মানেই একটা রাজকীয়তা। যারা তা দেখেনি, তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তারা ক্রিক ইনফো খুলে কিছু নীরস স্ট্যাটিস্টিক্স দেখুন। ওই পরিসংখ্যানগুলো আসলে কিছুই নয়। সাধে নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন, স্কোরবোর্ড একটা আস্ত গাধা! স্মার্টফোন, ইন্টারনেট শব্দগুলো তখন যেন আলোকবর্ষ দূরে। তখন ভাল লাগের প্রকাশ মানে কাগজে বেরোনো সেই তারকাদের ছবি কেটে খাতায় বা দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়া। ফেসবুকের দেওয়ালের থেকে সেই দেওয়াল কোনও অংশে কম রোমাঞ্চকর ছিল না।

বল হাতে কখনও ছুটে আসছেন ম্যালকম মার্শাল, কখনও জোয়েল গার্নার, কখনও অ্যান্ডি রবার্টস। পরের দিকে সেটা দাঁড়াল প্যাটারসন, ওয়ালসে। তারও পরে কোর্টলে অ্যামব্রোজ। সবথেকে ভাল লাগত কোর্টনি ওয়ালসকে। মনে পড়ে যাচ্ছে, সাতাশির বিশ্বকাপের একটি ঘটনা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা। ১ বলে চাই ২ রান। বল করছেন ওয়ালস। নন স্ট্রাইকিং এন্ডে সেলিম জাফর। ওয়ালস আম্পায়ারের কাছে আসতেই জাফর অনেকটা এগিয়ে গেছেন। চাইলেই রান আউট করতে পারতেন ওয়াসলস। কিন্তু রান আপ থামিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জাফরকে ফিরে আসতে বললেন। জাফর ফিরে এলেন। শান্ত পায়ে ওয়ালস আবার ফিরে গেলেন বোলিং মার্কে। বলাই বাহুল্য, শেষ বলে দুই রান তুলে নিয়েছিলেন আব্দুল কাদির। হারতে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ছিটকে গিয়েছিল সেমিফাইনালের আগেই। কিন্তু কেন জানি না, দলটাকে ভাল লেগে গেল। প্রেমে পড়ে গেলাম ওয়ালসের। ক্রিকেট নাকি ভদ্রলোকের খেলা। সত্যিই, সেদিন চূড়ান্ত ভদ্রতাই দেখিয়েছিলেন ওয়ালস। অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল ক্রিকেট।

পরের বিশ্বকাপ গুলোর কথা আর লিখছি না। কারণ, পরের বিশ্বকাপের আগে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ভিভ রিচার্ডস নাকি টিম থেকে বাদ। এমন সিদ্ধান্ত কোন আহাম্মক নিলেন, কিশোর মনে এই প্রশ্নটাই বারবার ঝড় তুলেছিল। সময় এগোলো নিজের নিয়মে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের গৌরব অনেকটাই হারিয়ে ফেলল। ততদিনে তাদের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলে ভাবাও হচ্ছিল না। ওয়ালস, অ্যামব্রোজ, হুপাররা তো ছিলেনই। এসে গিয়েছিলেন ব্রায়ান লারার মতো কিংবদন্তিও। তবু সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেন অতীতের ছায়া। তলিয়ে যেতে যেতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সোনালি সেই অতীত। তবু কী করে ভুলব সেই কৈশোরের অনুরাগ! কী করে ভুলব, রিচার্ডসের ছবি কেটে সেই দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়া!

নিজের প্রিয় দল বিশ্বকাপের আঙিনাতেই থাকবে না! এমন একটা নির্মম বাস্তব কী করে হজম করি!

গল্প

স্বপ্ন মেদুর

কুমকুম বসু দাস

পাঁচটা বেজে পঁচিশ। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে আলাপ। এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট। ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে ও। তবুও মনে হয়, দেরি হয়ে গেল। আসলে ঘড়িটা একটু এগিয়েই রাখে আলাপ। কারণ, সুলগ্না কখনই ছ'টা বেজে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি দেরি করে না। ভয় থাকে সুলগ্না কখন ওর চারতলার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে - আরও দুতলা উঁচু অর্থাৎ ছ'তলার ঘরে বসে আলাপ তা টেরই পাবে না। ফেরার সময় ভীষণ তাড়া থাকে সুলগ্নার। কী একটা নাকি গ্যালপিন ট্রেন আছে - সুলগ্নাদের ওখানেই প্রথম স্টপ। তাই ওই ট্রেনটা ও মিস করে না কিছুতেই।

এক এক সময় রাগ হয় আলাপের। কী দরকার ওর চাকরি করার। বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। বাবা সি ই এস সি-র চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। ভাই কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স করে পি এইচ ডি করছে। কী দরকার এত পরিশ্রমের চাকরির। বাড়িতে থাকলে তুমি আরও সুন্দর হতে। তোমার পাতায় ঘেরা গভীর চোখ দুটোর নীচে একটুও কালি জমত না।

এসব কি ভাবছে আলাপ! এখনও তো ওকে আর পাঁচজনের মতো 'মিস্ দাশগুপ্ত', 'আপনি' বলেই ডাকে আলাপ। তবে হ্যাঁ, প্রশ্নটা ওকে করেছিল। সুলগ্না বলেছিল, 'কেন? ভাল পোস্ট, মনের মতো স্যালারি। শুধু শুধু বাড়ি বসে কী করব বলুন।'

সত্যি তো। এত অবুঝ আলাপ। যদি সুলগ্না দাশগুপ্ত নামের এই মিষ্টি মেয়েটি এই ফার্মে চাকরি না নিত, তবে তাকে কোথায় পেত আলাপ সেন! না, তবে সুলগ্না কি চিরকাল

চাকরি করবে। না, তার কখনই করতে দেবে না আলাপ!

***

আজ দুটি বছর ধরে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে আলাপ। স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের আবরণে অন্য সকলের মতো আলাপের কাছেও নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সুলগ্না। তাতে আলাপ দমে যায়নি। বরং কালচার্ড ফ্যামিলির সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে এসেছে বলেই যে প্রগল্ভা হবে, তা চায় না আলাপ। কিন্তু ভালোবাসা অন্তর্যামী। সুলগ্না ওর মন বোঝে না এমন হতেই পারে না। বাড়ি ফেরার পথে বাসের পনেরো মিনিটের সান্নিধ্যে সুলগ্না হাসে, কথা বলে। মনে মনে তখন অনেক বেশি পায় আলাপ। সেই সেদিন

- ভীষণ বৃষ্টিতে ট্রাম নেই, বাস নেই, কোনও-মতে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল সুলগ্না। আলাপ সারাটা পথ ওর সঙ্গে ছিল। জলে কাদায় সুলগ্নার শাড়ির অনেকটা অংশ ভিজে গিয়েছিল। ওর ফর্সা ভিজে গোড়ালিটা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল আলাপের। তবুও একদিন কার যেন মৃত্যুর জন্য আগে আগে অফিস ছুটি হল। বাসে সুলগ্নার পাশে একই সিটে বসেছিল আলাপ। বাসের ঝাকুনিতে সুলগ্নার মৃদু ছোঁয়া লাগছিল আলাপের গায়ে। রোমাঞ্চিত আলাপ এখনও অনুভব করে সেই মুহূর্তটা।

****

সুলগ্না - সুলগ্না - তোমাকে নিয়ে কতদিন চলে গেছি মাঠ পেরিয়ে - ছোট্ট নদী ডিঙিয়ে। তোমার কোমর ছাপানো চুলের গোছা বাতাসে এলোমেলো। আমার হাতে হাত রেখে তুমি ভেসে ভেসে চলেছো। এমন সময় বৃষ্টি এল ঘনিয়ে। বাতাসে জলের গন্ধ। নাম না জানা নদীর ধারের শিমূল গাছের তলায় ডানা ভেজা পাখির মতো থামলে তুমি। আকাশে মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ধরা দিল মাটির বুকে, আমার কাছে তেমনি ধরা দিলে তুমি!

‘কীরে, বেরোবি না আজ?’ সৃজনের ডাকে চমকে ওঠে আলাপ। নিশ্চয় চলে গেছে সুলগ্না। শিয়ালদা রুটের বাস অনেকগুলো আছে। নিশ্চয় রাগ করে তার একটাতে চলে গেছে। যাবার আগে ওর আয়ত চোখ দুটো বার বার তাকিয়েছে দশতলা বিল্ডিংটার ছ'তলায়। ওর টিকলো নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অনেকগুলো বাস ছেড়ে তারপর আশপাশের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াতে বাসে উঠেছে। ‘কি মিঃ সেন, কাজের চাপ ছিল বুঝি আজ?’ এ কি, সুলগ্না তবে যায়নি! আলাপের জন্য দাড়িয়ে আছে! মৃদু হেসে আলাপ বলে- ‘না, মানে - আপনি বাস পাননি?’ সুলগ্না লাজুক মুখে বলে, ‘আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।’

আলাপ ঠিক শুনছে তো! সুলগ্না আলাপের জন্য অপেক্ষা করছিল! সুলগ্না, আমি জানতাম, আমার প্রতীক্ষা মিথ্যে হবে না। সুলগ্না, সেই কত দিন ধরে, লক্ষ কোটি বছর ধরে..... সৃষ্টির মুখে যেদিন প্রথম কথা জেগেছিল - জলের ভাষায় - হাওয়ার কণ্ঠে - সেই আদি যুগ থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্য।

‘মিঃ সেন, আগামী রবিবার আমাদের বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ। কাল আমি আসছি না। পরশু সেকেন্ড স্যাটারডে। সময় পাব না আর।

আমি স্টেশনে লোক পাঠাব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।' বলতে বলতে এক টুকরো কাগজে সব লিখে বুঝিয়ে দিল সুলগ্না। তারপর অভিভূত আলাপের খেয়াল নেই কখন সম্মতি জানিয়েছে, একসঙ্গে বাসে উঠেছে এবং নির্দিষ্ট ষ্টপেজে নেমেছে।

****

এরপর এসেছে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে পার হয়েছে কটা স্টেশন। তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ত বা একটু নার্ভাস আলাপ নেমেছে শ্যামনগরে। আচ্ছা, সেদিন তো সুলগ্নাকে জিজ্ঞাসা করা হল না, কী উপলক্ষে যেতে বলেছে ও। তবে কি সুলগ্নার জন্মদিন। কোনও উপহার আনা হল না তো!

'একসকিউজ মি, আপনি কি মিস্টার আলাপ সেন?' সুদর্শন এক তরুণের প্রশ্নে চমক ভাঙে আলাপের। 'হ্যাঁ----'। 'সুলগ্না আমার দিদি। আপনাকে নিতে এসেছি।' স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকুর মধ্যেই যথেষ্ট ভাব জমে উঠেছিল সুলগ্নার ভাইয়ের সঙ্গে। খুব মিশুকে ছেলে। স্বল্প ভাষিনী সুলগ্নার ভাই বলে মনেই হয় না। শুধু ও নয়। সুলগ্নার বাবা-মাও সমান আন্তরিক। কথায় গল্পে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের করে নিয়েছিলেন আলাপকে।

ছোট্ট সুন্দর বাড়িটা বেশ ছিমছাম - যেন কোনও নিখুঁত শিল্পীর হাতে সাজানো। ব্যালকনিতে বসলে দেখা যায় চারিদিকে জানা-অজানা গাছের সমারোহ। সুলগ্না, আমাদের ঘরটাও হবে ঠিক এমনই সবুজের মাঝখানে। জনারণ্য থেকে অনেক দূরে। তোমার হালকা রঙের শাড়ির ঘোমটা সরিয়ে একরাশ ঘন মেঘের মতো চুলে মুখ ডুবিয়ে বলব---।

একি! সুলগ্না কাঁদছে? টেবিলের উপর রাখা ওই ফটোতে মালা পরিয়ে - ধূপ জ্বালিয়ে - ওই প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কেন কাঁদছে সুলগ্না? 'মিঃ সেন, কেন কাঁদছি! আজ তিন বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমি কাঁদছি। যার ফটো দেখছেন - আজ থেকে চারবছর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমরা এক হয়ে ছিলাম। তারপর শুধু একটি বছর। অ্যাক্সিডেন্ট। মোটর দুর্ঘটনা ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে। একটু এগিয়ে বিছানায় শোয়া ছোট্ট এক শিশুকে বুকে তুলে নিল সুলগ্না। আদরে আদরে অস্থির করে তুলল ঘুমন্ত শিশুকে। 'মিঃ সেন, এই আমাদের ছেলে। শুধু ওর মুখ চেয়ে এই বিষাক্ত জীবনটা ধরে রাখতে হল। একি, আপনার চোখে জল কেন? আমি বিধবা বলে? কে বলেছে - দেখছেন না - আমি ভাল ভাল শাড়ি, গয়না পরি। প্রসাধন করি। আমার স্বামী প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গে আছেন। সকলে আড়ালে কথা বলে। কিন্তু আমি সুন্দর হয়ে থাকি। ও যে তাই চাইত।' একটা যন্ত্রণা চেপে আবার বলল - 'ওর পছন্দটুকু আজও ধরে রেখে আমি কি অন্যায় করেছি! মিঃ সেন, আমি দুঃখী, কাউকে সুখী করার অধিকার আমার নেই।'

ফেরার ট্রেনে আলাপ স্থানুর মতো বসেছিল। কিছু কথা বুক ঠেলে উঠে আসছে। 'সুলগ্না, আমার ভালোবাসাকে তুমি চিনেছিলে বলেই আজ কাছে ডেকে এমনি করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলে। তাই আজ আরও অনেক বেশি সুন্দর তুমি! কত যে সুন্দর, তা তুমি নিজেও জানো না।'

ছোট গল্প

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ

সুমন চৌধুরি

মাংসটা না ঠিক মতো সিদ্ধ হয়নি। খাসির মাংস যদি এরকম হয় ..।

—তা যা বলেছো। ফ্রায়েড রাইসটা কীরকম চাল চাল। আর এটা রাধাবল্লভি? ঠান্ডা ঠান্ডা চামড়া যেন। উফফ।

অজিতবাবু এবং সুখেনবাবু তাঁদেরই নিকট আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। টেবিলের উল্টোদিকে বসেছে সৃষ্টি। সুখেনবাবুর মেয়ে। সে খাচ্ছে এবং চুপচাপ দুজনের মুখের কথা শুনছে। ইতিমধ্যে মেয়ের দাদা এলেন। টেবিলে টেবিলে গিয়ে ভদ্রতার খাতিরে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, 'রান্না ভাল হয়েছে তো দাদা?' একসময় এনাদের টেবিলেও এলেন। জিজ্ঞেস করলেন। হাসি মুখে উত্তর দিলেন সুখেন বাবু ,'হ্যাঁ বাবা। রান্না ভাল হয়েছে।

সৃষ্টি অবাক। এই লোকটা এতক্ষণ তো কত কথাই না বলছিল। সৃষ্টি খেয়াল করল, মুখে যতই বলুক না কেন, দুজনে কিন্তু বেশ পেট পুরে খাচ্ছে। ভাত থেকে ফ্রায়েড রাইস, খাসির মাংস থেকে শুরু করে ইলিশ মাছ। তারপর ফিশ ফ্রাই এবং আরও যা যা আছে। খাসির মাংস সিদ্ধ হয়নি বলে ছেড়ে দিচ্ছে তা নয়। বা ফ্রায়েড রাইস চাল চাল ভাব থাকায় যে খাচ্ছে না তা নয় কিন্তু।

সৃষ্টি ভাবছে, তবে মানুষ এত দুমুখো হয় কীভাবে? অবশেষে শেষ পাতে আই-সক্রিম এবং পান এল। সৃষ্টি সেগুলো হাতে নিয়ে হাত ধুতে চলে গেল। সৃষ্টির বয়স এখন বাইশ। কথা বার্তা চলছে। মানে পাত্রের খোঁজ চলছে। অবশেষে পাত্র পাওয়া গেল সৃষ্টির জন্য। খুব ভাল ছেলে। কলকাতায় থাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবার। ঋষি। বড় ব্যবসা আছে নিজের।

ধীরে ধীরে সৃষ্টি আর ঋষির মেলামেশা বেড়ে উঠল। প্রতি সপ্তাহে দেখা করা, একে অপরকে গিফ্ট দেওয়া এসবের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রেম জমে উঠল তাদের। সৃষ্টি বুঝতে পারল, তার এবং ঋষির ভাবনা চিন্তা প্রায় একই প্রকারের। বিভিন্ন বিষয়ে দুজনের একই মত থাকে। বিয়ের দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সৃষ্টি কয়েকদিন ধরে যেন একটু চিন্তায় পড়েছে। ওর মা ভাবল, মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে, তাই হয়তো একটু চিন্তায়। কিছুদিন মেয়ের এরকম অবস্থা দেখে সুখেন-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মা তোর? 'সৃষ্টি একটু ভেবে বলল, 'বাবা, কোনও আত্মীয়কে আমার বিয়েতে ডেকো না প্লিজ।'

—মানে?

—আমি ঋষির সঙ্গে কথা বলেছি। ও ও রাজি। কোনও আত্মীয়কে ডেকো না। মন্দিরে বিয়ে করবো। আর তাতে খরচ কম হবে।

— তোকে খরচের চিন্তা করতে হবে না মা। তোর বাবা আছে তো ?

— বাবা, তোমার মেয়ের সব আবদার রেখেছো সবসময়। এরপর তো অন্য কারোর বউ হয়ে যাব। হ্যাঁ, তোমার মেয়ে থাকব অবশ্যই। কিন্তু তখন আমার ওপর আরও একজনের অধিকার জমবে। তার আগে এই একটা শেষ আবদার। যে টাকাটা বাঁচবে সেই টাকায় সেই দিন মন্দিরের সামনের

ওই গরিব মানুষগুলোকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দাও।

একটু ভেবে সুখেন বাবু বললেন,—আচ্ছা, তাই হোক। ভগবান জানে যে তুই আসলে কী চাস।

কথা মতো মন্দিরেই বিয়ে সম্পূর্ণ হল। মন্দিরের সমস্ত ভিখারি সেইদিন ভুরিভোজ সারলেন এবং দু হাত তুলে সৃষ্টি এবং ঋষিকে আশীর্বাদ করলেন। সৃষ্টি নিজে বিয়ের শেষে খাবার বেড়ে দিল। ঋষি হাত বাড়ালো। খাওয়ার শেষে সৃষ্টি এসে নিজের বাবাকে জিজ্ঞেস করল, এটাই ভাল। বলো বাবা?

—হ্যাঁ, সে ভাল। কিন্তু এরকম? আত্মীয়রা আসলেও বা কী হত?

সৃষ্টি হেসে বলল, তোমার সারা জীবনের আয় দিয়ে তুমি লোক খাওয়াবে আর ওরা এসে এক মুহূর্তে তোমার সমস্ত উপার্জনের একটা ইয়ার্কি বানিয়ে চলে যাবে। কেউ বলবে, —উহ। খাসির মাংসটা ঠিক সিদ্ধ হয়নি, বা রাধাবল্লভিটা একেবারে ঠান্ডা। তুমি বলতো বাবা, নিজের মেয়ের বিয়ের সময় এসব কথা যদি কানে আসে তখন কেমন লাগে? আর এমন নয় যে লোক খাবে না। খাবে। পেট পুরে খাবে আর তারপর এসব বলবে। তার থেকে বরং ওদের দেখো। ওই হাসিটাতেই যেন আমার বিয়ের সার্থকতা।

সুখেনবাবু একটু লজ্জা পেলেন বটে। কিন্তু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘কেন জানি না, আমার এখন ইচ্ছে করছে তোকে আজীবন আমার কাছে রেখে দিই। আগলে রাখি তোকে। কিন্তু বাবা তো। নিজের সুখের আগে মেয়ের সুখ দেখব। মন দিয়ে সংসার করিস মা। তোর শ্বশুর বাড়ি খুব ভাগ্যবান। তোর মতো একজন কে বউ হিসেবে পেয়েছে।’

বেঙ্গল টাইমসের বিভিন্ন সংখ্যায় এক বা একাধিক গল্প প্রকাশিত হচ্ছে।

চাইলে, আপনিও অণু গল্প বা ছোট গল্প পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

ছৌ মুখোশের চড়িদা গ্রামে একটি দিন

ছৌ নাচের কথা কে না জানেন! কোথায় তৈরি হয় সেই ছৌ–মুখোশ? অযোধ্যার লাগোয়া সেই চড়িদা গ্রাম থেকে ঘুরে এসে লিখলেন বুবুন ঘোষাল।

পুরুলিয়া বললেই সবার আগে কোন ছবিটা ভেসে ওঠে। যারা শিক্ষা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত বলবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। যাঁরা ঘুরতে ভালবাসেন, তাঁরা হয়ত বলবেন অযোধ্যা পাহাড়ের কথা। হ্যাঁ, এই দুটোর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে, এমন কোনও বিষয়? এমন কোনও লোকসংস্কৃতি? আর ক্লু দেওয়ার দরকার নেই। ছৌ নাচের ছবিটা এতক্ষণে নিশ্চয় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, এই ছৌ নাচের কথা বললে, এককথায় ভেসে ওঠে পুরুলিয়া জেলার নাম।

কিন্তু এই ছৌ মুখোশ কোথায় তৈরি হয়? হঠাৎ করেই সেই গ্রামে যাওয়ার সুযোগটা এসে গেল। আমরা গিয়েছিলাম পর্বতারোহনের প্রশিক্ষণ শিবিরে। এত

কাছে এলাম। আর ছৌ গ্রাম চড়িদায় যাব না? বাঘমুন্ডি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কয়েকটা বাইক নিয়ে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম চড়িদার পথে। গ্রামটা যে খুব আহামরি, এমন নয়। দক্ষিণ বঙ্গের আর দশটা গ্রাম যেমন হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকমই। ছোট্ট গ্রাম। গোটা তিরিশেক পরিবার। সব পরিবারই কোনও না কোনওভাবে এই ছৌ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামে যে মুখোশ তৈরি হয়, সেটাই পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও।

গ্রামের মানুষগুলি বেশ সাধাসিধে। মুখোশ বানালেও ওদের মুখে কোনও মুখোশ নেই। একটু কান পাতলেই ওদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবেন। বংশ পরম্পরায় চলছে ঠিকই। কিন্তু কতদিন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ওঁরা নিজেরাও সংশয়ে। এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, আমাদের তৈরি মুখোশ বিদেশে মোটা দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু সেই টাকা তো আমাদের ঘরে আসে না। কাদের কাছে যায়, কে জানে!

মূলত কাগজ আর আঠা দিয়েই তৈরি হয় এই মুখোশ। গ্রামের ৪–৫ বছরের শিশু যেমন কাজ করছে, তেমনি ৮০ বছরের বয়স্ক মানুষটিও দিব্যি হাত লাগাচ্ছেন। বাড়ির মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কেউ শুরুর দিকটা এগিয়ে দেয়। কেউ ফিনিশিংয়ে বেশি পারদর্শী। কারও হাতে রঙের কাজ দারুণ খেলে। কেউ কাগজ কেটে রাখে, কেউ আঠা তৈরি করে। সব ঘরেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। সব ধরনের মুখোশ যে সবাই বানাতে পারেন, এমন নয়। মূলত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই হয় ছৌ পালা। রামায়ন, মহাভারত, মহিষাশূরমর্দিনী এগুলোই বেশি জন-প্রিয়। এইসব পালার বিভিন্ন চরিত্রের আলাদা আলাদা মুখোশ।

এই মুখোশগুলো কি শুধু ছৌ শিল্পীদের

জন্য? মোটেই না। আপনি-আমিও কিনতে পারি। ছৌ নাচ নাচতে নাই বা পারলেন। বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে তো আপত্তি নেই। শহুরে অনেক বাড়িতেই শোভাবর্ধন করে এই মুখোশ। যাঁরাই অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে আসেন, তাঁদের অনেকেই ঘুরে যান এই গ্রাম থেকে। শীতের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের মতোই বিদেশিদের আনা-গোনাও লেগেই থাকে। বিদেশিরা আসার আগে নেট ঘেঁটে এ তল্লাটের নানা হেরিটেজের কথা আগেই জেনে আসেন। আর সেই হেরিটেজের তালিকায় চড়িদা গ্রাম তো আছেই। তাঁরাও এই গ্রামে আসেন, ছবি তোলেন, ভিডিও তোলেন। কত তথ্যচিত্র যে তৈরি হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! দেশি-বিদেশি কোন ম্যাগাজিনে কোন ছবি ছাপা হচ্ছে, তার হদিশও পাওয়া মুশকিল। এভাবেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে এসেই অনেকে মুখোশ নিয়ে যান। আবার শীতের সময় রাজ্যের নানা প্রান্তে মেলা বসে। সেখানেও ডাক পড়ে শিল্পীদের। সেইসব মেলায় বিক্রি হয় ভালই। কখনও এজেন্ট মারফত নানা জায়গায় যায়। অনলাইনে কেনার সুযোগ নেই ঠিকই, তবে ফোনে অর্ডার দেওয়াই যায়। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন কি চড়িদার কথা জানে! জানলে হয়ত বিপণনের নতুন দরজা খুলে যেত। আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারত।

অযোধ্যার সেই বিস্ময়মানব

শান্তনু পাঁজা

যে কোনও জায়গায় বেড়াতে গিয়ে আমাদের কত অভিজ্ঞতাই না হয়, কত অমূল্য স্মৃতিই না আমাদের সঙ্গী হয়। এই স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আর কিছু বিশেষ অনুভূতি, এইগুলোর জন্যই তো আমরা ভ্রমণ পিপাসুরা মানুষেরা পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে চলা ফেরা করি, তাই না? এইরকমই এক স্মৃতির কথা বলব যা আমার জীবনকালে আমি কোনওদিন ভুলব না।

পুজোর ছুটিতে আমরা তিন মূর্তি (আমি আর আমার দুই বন্ধু যাকে বলে জিগরি দোস্ত আরকি) প্ল্যান করলাম বাইকে পুরুলিয়া যাব। কথামতো অযোধ্যা পাহাড়ের খুব কাছে নিরিবিলি পরিবেশে একটা রিসর্ট বুক করলাম। সপ্তমীর দিন সকাল সকাল মা দুগ্গার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার হয়েছিল, ভাবটা এরকম যেন ছেড়ে যাচ্ছি বলে আমার শহর কলকাতা আমার উপর অভিমান করেছে। ঠিক করলাম মুম্বাই হাইওয়ে ধরে খড়্গপুর হয়ে ঝাড়গ্রাম–বেলপাহাড়ি হয়ে

যাব। মনটা বেশ খুশি খুশিই ছিল। কথা ছিল ঝাড়গ্রামে আমাদের তিন মূর্তির এক মূর্তির বাড়িতে পেটপুজো করে পুরুলিয়ার দিকে পাড়ি দেব। সমস্ত পথে মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে পূজা মণ্ডপ গুলোর গান আর ঢাকের বাদ্দি শুনতে শুনতে চলেছি। আমার মনটাও খুশিতে আকাশে উড়ছিল, ঠিক যেমনটা আমার পক্ষীরাজ, আমার বাইকটাও ঝড়ের বেগে চলেছিল। ঘুমের মধ্যে মিষ্টি স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, আমারও ঠিক তাই হল। আমার avenger হঠাৎ করে বিকট যান্ত্রিক আর্তনাদ করতে করতে থেমেই গেল। খড়্গপুর পৌঁছাতে তখনও ৩ কিলোমিটার বাকি। কভার খুলে দেখলাম ব্যাটারি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পড়লাম মহা ফাঁপরে। হাইওয়ের ধারে, সুনসান জায়গা কোথাও কোনও বাড়ি, ঘর, দোকান কিছুই চোখে পড়ছে না। গাড়ি ঠেলে সামনে এগোনো ছাড়া কোনও উপায় দেখলাম না। কপাল গুনে একটু দূরেই একটা চায়ের দোকান পেলাম। চা দোকানের লোকটা জানাল একটা মেকানিক দোকান আমরা ফেলে এসেছি সেটা বেশি দূরে নয়। বুকে বল পেয়ে গাড়ি ঘোরালাম উল্টো পথে। দোকানটা পেয়েও গেলাম কাছেই। সব দেখেশুনে মেকানিক ভাইটি বলল, ব্যাটারি বদলাতে হবে। প্রায় ঘন্টা খানেক বসে থেকে কাজ করানোর পর আমার avenger আবার চলতে শুরু করল। বুক থেকে পাথর নামলো যেন…. ভাবলাম এই যাত্রায় বেঁচেই গেছি, কিন্তু মা দুর্গা অন্য কিছুই লিখেছিলেন কপালে।

যাইহোক, ঝাড়গ্রামে বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে খাওয়া দাওয়া করে বেরোবো বলে তৈরি। অমনি কোথা থেকে এক দল কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকেছে, বৃষ্টি নামল বলে। অপেক্ষা না করে বর্ষাতি পরে রওনা দিলাম। বড়োজোর ১০ মিনিট গাড়ি চালিয়েছি, অমনি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি রে ভাই…. সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর কি। পথের ধারের এক দোকানে আশ্রয় নিলাম, বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। অবশেষে আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই আবার যাত্রা শুরু। এরপর আর বিশেষ কোনও অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। রহস্যময় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জগরের মতো রাস্তা চলেছে…. পাহাড়ি চড়াই উতরাই পথে গাড়ি চালিয়ে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। অবশেষে রাত ৮টায় পৌঁছলাম যাযাবরী ইকো অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে। রাতটা ঘুমিয়েই কাটল।

পরদিন অষ্টমীর সকালে লুচি আলুর দম আর চা সহ জলখাবার শেষ করে চললাম পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখতে। বামনি ফলস, মার্বেল লেক, হিল টপ সব দেখে যখন আপার ড্যামে পৌঁছোলাম, কপালটা আবার পুড়লো। আমার avenger আবার হাত তুলে দিয়েছে। অগত্যা এক মেকানিক ডাকা হল যে আমার বাইক ২ ঘন্টা ধরে নাড়াচাড়া করেও ধরতে পারল না রোগটা কী। এবার শুরু হল আমার শারীরিক আর মানসিক

ক্ষমতার পরীক্ষা। ডাউনহিলে বাইক ঠেলে নামতে নামতে যখন নিচে এলাম, তখন আমাদের তিনজনের কারোর মধ্যেই আর কোনও শক্তি বেঁচে নেই। কাছের একটা মুদিখানা দোকান দেখে একটা দড়ি পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম আমার গাড়িটা বন্ধুর গাড়িতে বেঁধে টেনে নিয়ে যাব বলে। দোকানের লোকটি কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই একজন মানুষের খোঁজ দিলেন। বললেন, সামনের ওই চা দোকানে যাও, ওখানে গেলে তোমার গাড়ির কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। আমাদের চিন্তা ভাবনার শক্তি লোপ পেয়েছিল, অগত্যা গেলাম সেই দোকানে।

এখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় ভোটা দার সঙ্গে। যিনি এক উদ্ধারকারী রূপে এন্ট্রি নিলেন। গ্রামের মানুষ সত্যিই কত সহজ সরল হন আর কারও বিপদে প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আবারও সেটা চোখের সামনে দেখলাম। ভোটাদা আর তার আরও ৪–৫ জন্য সাঙ্গ পাঙ্গ জুটে গেল আমার গাড়িটা মেরামত করতে। সবাই বলল, ‘আপনারা রিসর্টে ফিরে যান, স্নান খাওয়া দাওয়া করুন, সকাল থেকে কিছু খাননি, আমরা দেখছি, ঠিক হলেই খবর দেব।’

আশায় বুক বেঁধে আমরা রিসর্টে ফিরলাম। স্নান খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, অমনি ফোনের রিং বেজে উঠল। ভোটাদা কল করেছেন, বললেন ‘দাদা, আপনার গাড়ি স্টার্ট হয়েছে। এসে নিয়ে যান’। উফঃ বুক থেকে যেন পাথর নামল। সন্ধেবেলা গেলাম গাড়ি আনতে। সবাই কত খুশি, আমি জাস্ট ভাবছি শহরের মানুষও যদি এতটা হেল্পফুল হতো। একজন অচেনা অজানা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে এরা কত আনন্দ পাচ্ছে। যাইহোক ভোটাদা দের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি নিয়ে রিসর্টে ফিরলাম। নিশ্চিন্ত হলাম যে কাল গাড়িটা নিয়ে কলকাতা ফিরতে পারব। রাতে ছৌ নাচের আসর বসল। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম সবাই, তারপর খাওয়া দাওয়া করে এক্কেবারে সোজা বিছানায়। সারাদিন যা ধকল গেছে! ঘুম আসতে সময় লাগল না। কিন্তু তখনো বুঝিনি আমার কপালে পরের দিন আরও বড় কিছু লেখা আছে।

পরদিন সকালে উঠে তৈরি হয়ে ফেরার পথ

ধরলাম। বড়োজোর ১ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছি। আবার আমার avenger দিল হাতটি তুলে, সে আর এগোবে না। উপায় না দেখে আবার ভোটাদার শরণাপন্ন হতে হল। আর অবাক হওয়ার বিষয় যে উনি ৫ মিনিটের মধ্যে হাজির। সবকিছু দেখে বললেন, 'দাদা, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, গাড়ির রেগুলেটার খারাপ হয়েছে। সময় লাগবে। কারণ, বাঘমুন্ডি বাজারে বাজাজের পার্টস পাওয়া যায় না।' জিজ্ঞেস করলাম উপায় কী? উনি বললেন, 'পুরুলিয়া টাউন থেকে পার্টস আনতে হবে, দেখছি কী করা যায়।' এরপর আমরা ওনার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে শুধু বসে রইলাম। উনি ওনার যত কন্টাক্ট আছে সবাইকে একের পর এক ফোন করলেন। অবশেষে লোকজন জোগাড়ও করলেন। ওনার জানা শোনা একজন পুরুলিয়াতে পার্টস কিনলেন তারপর একটা স্টেট বাসের ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। এই সমস্ত ঘটনার মাঝে কখন সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে খেয়াল ছিল না। কিন্ত ভোটাদা একবারও আমাদের ছেড়ে কোথাও গেলেন না। বললেন, 'দাদা পার্টস আসতে সময় লাগবে, সন্ধে হয়ে যাবে, আজকে আর ফিরে কাজ নেই, আজ এখানেই কোনও গেস্ট হাউসে থেকে যান।'

অগত্যা রাজি হতে হল। তারপর উনি আমাদের একটা ভাল হোটোলে লাঞ্চ করালেন, ভাল একটা গেস্ট হাউস সস্তায় বুক করে দিয়ে তারপর বাড়ি গেলেন। বলে গেলেন পার্টস এলে জানাবেন। পার্টস পেতে রাত হল, প্রায় ৮টা। তখন সব দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভোটাদা ফোন করে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, কাল সকালেই আপনার কাজটা করে দেব, নিশ্চিন্তে ঘুমোন।' পরের দিন সক্কাল সক্কাল ভোটাদা এসে হাজির। আমাদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন, চা খাওয়ালেন, তারপর চলে গেলেন দোকানে। বলে গেলেন, 'আপনারা তৈরি হন, আমি দোকানে গিয়ে কাজটা করে দিই।' আমরা তৈরি হতে হতে উনি গাড়ির কাজ করে হোটেলে নিয়ে চলেও এলেন।

বেরোনোর আগে ভোটাদা কে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা সার্ভিস চার্জ কত দেব? উনি তো কিছুতেই বলবেন না, বার বার বলছেন, 'আপনাদের যা মনে হয় দিন।' উনি আমাদের জন্য যা করলেন তার সত্যিই কোনও দাম হয়না। শেষে ওনাকে যা দিলাম তাতে উনি খুশিই হলেন মনে হল। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে বললেন, 'দাদা, আবার আসবেন, এলে দেখা করবেন, বাড়ি পৌঁছে খবর দেবেন।'

এই হচ্ছে ভোটাদার গল্প, ভোটাদাদের গল্প, যাঁরা আজও মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ান। ক্ষমা করবেন, দুশ্চিন্তায় আর অনিশ্চয়তার মাঝে ভোটাদার কোনও ছবি তুলতে পারিনি।

শান্ত গ্রাম বারমিক

কুয়াশাঘেরা জোড়পোখরি

রুমা ব্যানার্জি

শহুরে একঘেয়েমিতে ক্লান্তজীবন যখন প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চায়, তখন মন ছুটে যায় নীল সবুজ হিমালয়ের কোলে কোনও অজানা গ্রামে। সেখানকার সোঁদা মাটির গন্ধ, ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক, হোমস্টের রান্নাঘর থেকে নেপালি সুরে গুনগুন, দূরে পাহাড়ের গায়ে জ্বলে থাকা টিমটিমে আলো — সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুটা নিমরাজি কর্তাকে বাগে পেয়ে বললেই ফেললাম, চলো কদিন পাহাড়ে ঘুরে আসি। হাতে বেশিদিন ছুটি নেই, বড়জোর চার– পাঁচ দিন। তাই বা মন্দ কী? কর্তা রাজি, শুধু শর্ত একটাই, দার্জিলিঙে থাকা চলবে না। অগত্যা তাতেই রাজি।

আগে থেকে তেমন প্ল্যান ছিল না। তাই বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। সে ফোন করে একটা মনের

মতো হোমস্টেও খুঁজে দিল, শহর থেকে দূরে, যেমনটি চাইছিলাম। বারমিক, কালিম্পং এর কাছে একটা নির্জন গ্রামে। গাড়িও ঠিক হল। এন জে পি থেকে তুলে নেবে। চালাও পানসি বেলঘরিয়া!

ভোরবেলায় দার্জিলিং মেল থেকে নেমে বাক্স পেঁটরা নিয়ে চড়ে বসলাম নির্দিষ্ট গাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে একটু প্রাতরাশ, তার পর সেবক রোড ধরে সোজা বেঙ্গল সাফারি। আমার বন্য জীবজন্তু দেখার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। খোলা পরিবেশে, সতর্ক পাহারায় দক্ষিণরায়কে দেখা এই প্রথম, তাও একহাত দূরত্বে। বানর, হাতি, হরিণ, ভাল্লুক, ময়ূর সব দেখার পরে দর্শন দিলেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। অলস পায়ে, ঘাড় ঘুড়িয়ে, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলে গেলেন সামনে দিয়ে। মন বলল, মহারাজা তোমাকে সেলাম।

সন্ধ্যা নামার মুখে পৌঁছে গেলাম বারমিক, পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট গ্রাম। ছড়ানো-ছেটানো কিছু বাড়ি। কালিম্পং থেকে রংপো যাওয়ার যে পাকা রাস্তা গ্রাম চিরে চলে গেছে, তার ধারে গোটা চার-পাঁচ দোকান। নিচে, অনেকটা নিচে খানিকটা সমানমতো জায়গায় একটা খেলার মাঠ। পাশে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আরেকটা ঝরনা আছে গ্রামের গা-ঘেঁষে। অনেকখানি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে একটা চওড়া পাথরের ওপর পড়ছে। সেখান থেকে প্লাস্টিকের বোতলে বা জারিকেনে ভরে জল আনে গ্রামের লোকেরা। সেটাই বলতে গেলে বারমিকের খাওয়ার জল। বাকিটা বৃষ্টির জল ধরে রেখে। পর্যটক এলে জলের গাড়ি বুক করতে হয়। পথচলতি ড্রাইভাররা অনেক সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঝরনা থেকে তাদের বোতলে জল ভরে নেয়। এসব নিয়েই এই গ্রাম। মালিক বেশ

আন্তরিকভাবে হাসি মুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। ছোট্ট ছিম ছাম অথচ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূরে চোখ যায়, শুধু সবুজ। মালকিনের হাতের রান্না সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কারণ, পরের দিন কালিম্পং যাব।

কালিম্পং তিস্তা নদীর ধারে একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। এমনিতে শহরটা বেশ ঘিঞ্জি। তবে দর্শনীয় স্থান অনেক। শহরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর হাউজ। কালিম্পংয়ের আরেক দ্রষ্টব্য লেপচা মিউজিয়াম। এই শহরে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ, চার্চ অতিমারির কারণে বন্ধ। বিখ্যাত মর্গ্যান সাহেবের বাংলো সেটাও বন্ধ। আসলে, যাদের বুকিং থাকে, শুধু তাদের জন্যই খোলা। সামনেই একটা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে ক্যাফেটোরিয়ায় বসলেই মন জুড়িয়ে যায়। যতদূর চোখ যাবে, গলফ কোর্স। এখানে কত যে সিনেমার শুটিং হয়েছে! এই মর্গ্যান হাউসেরও একটা ঐতিহ্য আছে। হন্টেজ হাউস খুঁজলেই একেবারে শুরুতে এসে যায় এই বাংলোর নাম। সাহেবি আমলের বাংলো। এখন পর্যটন দপ্তরের অধীনে। ভেতরটা নাকি অত্যাধুনিক, কিন্তু বাইরে দিকের আদলটা ইচ্ছে করেই ভুতুড়ে রাখা হয়েছে। কাছেই দূরপিন মনেস্ট্রি। ওখানে গেলেই মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আসে। দারুণ একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে।

ক্যাকটাসের মনোমুগ্ধকর সংগ্রহ দেখতে গেলাম, পাইন ভিউ নার্সারিতে। এছাড়া হনুমান পার্ক, দুর্গামন্দির, কালীমাতা মন্দির প্রভৃতি জায়গা দেখার মতো। তিস্তা বাজারে মংপুর রেস্টুরেন্টে খেয়ে পেট মন দুটোই ভরল। এখনও মোমোর সুবাস পাচ্ছি যেন।
পরেরদিন দার্জিলিং, আমার স্বপ্নের শহর, দার্জিলিং। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের গায়ে ধূসর মেঘেদের আনাগোনা, সবুজ উপত্যকার গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, আর পাইন, দেবদারুর সাথে রডোড্রেনড্রন,

ক্যামেলিয়ার মেলবন্ধন ভ্রমণপ্রেমীদের বার বার টেনে নিয়ে যায় দার্জিলিং। মেঘ–কুয়াশার লুকোচুরিতে ব্যস্ত শহরের পাশ দিয়ে চলে যায় টয় ট্রেন। পাইনের অন্ধকার মাখা পিস প্যাগোডা যাওয়ার রাস্তা আমাকে বড্ড আর্কষণ করে। ভিউ পয়েন্টের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বারবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কুয়াশায়, মেঘেদের ভিড়ে। গ্লেনারিজ আর ম্যাল ঘুরে তীর্থ করার আনন্দ নিয়ে রওনা হলাম। শর্ত অনুযায়ী দার্জিলিংয়ে থাকা হবে না। সুতরাং ঠিক হল থাকব কিছুটা দূরে, জোড় পোখরিতে।

জোড় পোখরি, হিমালয়ের কোলে পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে ঘেরা, কুয়াশা মাখা একটা ছোট্ট জায়গা প্রায় ৭৬০০ ফুট ওপরে, সেঞ্চল অভয়ারণ্যের একটা অংশ। এখন একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন। অন্যদিকে কার্শিয়াং আর দার্জিলিং।

দার্জিলিং ঘুরে রওনা হলাম জোর পোখরির উদ্দেশ্যে। চড়াই উতরাই পেরিয়ে মাত্র ১৯ কিমি রাস্তা। সান্দাকফু যাওয়ার জন্য মানেভঞ্জন বা চিত্রের দিকে না গিয়ে ধরলাম সুখিয়া পোখরির পথ। শুনশান রাস্তা, পাইন গাছের পাতা ঘেঁসে হওয়ায় বাজছে এক নৈসর্গিক সুর, দিনের শেষ তাই পাখির কূজনে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মায়াবী সুরের ঝর্না, পথে রয়েছে কংক্রিটের তৈরি বেঞ্চ যেখানে বসে এই আনন্দ উপভোগ করা যায়।

সন্ধ্যা নামছিল পাইনের পাতা বেয়ে। কুয়াশা আর মেঘ চপল কিশোরীর মতো পথের আঁকে বাঁকে খেলা করছে দল বেঁধে। কান পাতলেন শোনা যায়, গাছ থেকে টুপ টাপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। আমাদের ড্রাইভার জানালো সামনেই একটা গোরস্থান, সব মিলিয়ে একটা গা শিরশিরে অনুভূতি ঘিরে ধরল।
যতক্ষণে আমরা হোমস্টেতে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। যদিও ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। দূরে কার্শিয়াং শহর জুড়ে আলো জ্বলছে। এমনকী বাগডোগরার আলো পর্যন্ত দেখা গেল।

হাতে গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম স্বপ্নের রূপকথার রাজ্যে। সব যেন ঘুমিয়ে আছে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। যদিও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি নেই, তবে শুনলাম ওখানে হিমালয়ের স্যালামান্ডার দেখা যায়। যার আঞ্চলিক নাম গোড়া এবং বেশ কিছু বছর আগে ভাল্লুক দেখা গেলেও এখন আর তেমন বন্যপ্রাণী দেখা যায় না। নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, বড় বড় জানালার পর্দা সরালেই সামনেই দুটো পুকুর, এই জোড়া হ্রদের জন্যই জায়গার নাম জোড় পোখরি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এতটাই ঠান্ডা লাগছিল যে রুমহিটার নিতে হল। গরম গরম খাবার খেয়ে আমরা সে দিনের মতো যে যার ঘরে লেপ কম্বলের মধ্যে সিঁধিয়ে গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ঝকঝকে আকাশ আর সামনে অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মোহিনী রূপে মাথায় সোনার মুকুট পরে উপস্থিত। সে দৃশ্য বর্ণনা করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি, শুধুই মুগ্ধতায় ঈশ্বরের এই অসীম দান প্রাণ ভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই নেমে এল মেঘমালা, ঢেকে দিল আশপাশ। একটু আগের রূপের সঙ্গে কোনও মিল নেই এই কুয়াশা ভরা সকালের। দিন যত বাড়ল, কুয়াশা ততই ঘন হতে লাগল। সামনের শান বাঁধানো পুকুর একটা বিরাট সাপের মূর্তি যেন এই কুয়াশায় কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছিল। জ্বলে সাঁতার কাটছে বেশ কিছু হাঁস, দূরের বাগানটায় চরে বেড়াচ্ছে আরও কতগুলো। পুকুর দুটি ঘিরে যত্নে লালিত মরশুমে ফুলের সারি আর তারপর সীমানা প্রাচীরের মত পাইন গাছের সারি, এক অসামান্য মেল বন্ধনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মিরিকের পথ ধরে নিলে ফিরতে সময় লাগার কথা সাড়ে তিন ঘন্টা। তাই সকালটা ঘুরলাম চারিদিকে। আমি তখনও আমার চাতক মনটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। ফেরার সময় নেপাল বর্ডারের এর কাছে পশুপতি মার্কেটে ঘোরা হল না, কারণ আতিমারির কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে দুঃখও নেই, যে দৃশ্য মন ভরে দেখেছি সেটা ফিরে অনেক দিন অক্সিজেন দেবে, বেড়ানোর এটাও একটা সুখ যে ঘুরে এসে সেই সুখ স্মৃতিকে মনে করে ঘটনার জাবর কেটে প্রতিটা মুহূর্ত আবার নতুন করে স্মৃতি পটে ফুটিয়ে তোলার আনন্দই আলাদা।

বৃষ্টির ধারা ও জঙ্গলের মাঝে অনন্ত ধারাগিরি

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সদ্য একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঝুড়ো লালমাটি বৃষ্টির জল পেয়ে জমাট বেঁধে গেছে। চারপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড়গুলি যেন কালচে সবুজ হয়ে গেছে। শুধু কালচে বললে ভুল বলা হবে, সবুজের যে এত প্রকারভেদ থাকতে পারে, তা বর্ষাকালে এখানে না এলে জানতেই পারতাম না। চারপাশে টিলা, তার মধ্যে দিয়ে হালকা চড়াই পথ বেয়ে হাঁটতে বেশ লাগছে। এমন সময় পিছন থেকে আমার সহকর্মীর ডাকে হুশ ফিরল। সে চেঁচিয়ে বলছে, ‘বাকি পথটা কি হেঁটেই যাবে?’ সত্যিই তো, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। চেঁচিয়ে বললাম, ‘তোমরা এসো, আমি এখান থেকে উঠে পড়বো।’

আসলে, আমাদের অটোটা চড়াই বেয়ে উঠতে না পারার জন্য আমরা সবাই নেমে পড়েছি। আমরা বলতে আমি আর আমার দুই কনিষ্ঠ সহকর্মী। ওরা অটোর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে উঠছে। আমি একা হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশিই এগিয়ে গেছি। কলকাতা থেকে ভোরের ইস্পাত ট্রেনে চেপে ঘাটশিলায় এসে সেখান থেকে একটা অটো ঠিক করে প্রথমেই ধারাগিরির দিকে রওনা দিয়েছি। বুরুডি জলাধারের পাশে যে অস্থায়ী পরিকাঠামো যুক্ত খাবার জায়গাগুলো আছে, তারই একটিতে দেশি মুরগির ঝোল আর ভাতের বরাত দিয়ে চলেছি ধারাগিরির উদ্দেশ্যে। মাঝপথে এই ক্ষুদ্র বিপত্তি। অবশেষে একটু সোজা পথ পেয়ে অটো পৌঁছে দিল ধারাগিরির দোরগোড়ায়। যেখানে নামলাম, সেটা একটা উপত্যকার মতো। চারদিক সবুজ পাহাড়ে ঘেরা মাঝখানে ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে একটা সরু লালমাটির পথ সোজা জঙ্গলে চলে গেছে। ওই পথ ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা গেলেই ধারাগিরি ঝর্ণা। আমরা একজন আদিবাসী মহিলাকে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে গাইড হিসাবে নিলাম। যদিও এখানে কোনও গাইডের দরকার পড়ে না। কারণ, একটাই পথ সোজা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ধারাগিরি পর্যন্ত চলে গেছে। ভুল হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একজনকে সঙ্গে নিলে এদের একটু উপার্জন হয় এই আর কি। তাছাড়া এরা কিন্তু কোনও সাহায্য চাইছে না, কাজের বিনিময়ে অর্থ চাইছে, এটুকু তো করা যেতেই পারে।

মিনিট পনেরো কুড়ি জঙ্গলের লালমাটির পথ। কখনও আবার নুড়ি পাথরের পথ। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঝর্ণার সামনে পৌঁছে গেলাম। ফেরার পথ চিনতে আর কোনও সমস্যা হবে না বুঝে মহিলাটিকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। সে যেতে চাইছিল না। আমাদেরকে নিয়েই ফিরতে চাইছিল। কিন্তু আমরা একটু বেশিক্ষণ থাকব। তাই অযথা আটকে রেখে লাভ নেই, যদি

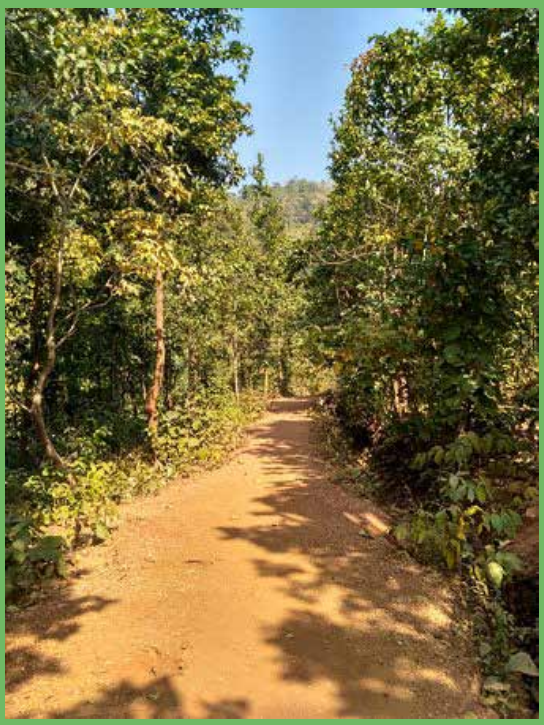

ফিরে গিয়ে আর কোনও পর্যটক পায়, তাহলে ওরই সুবিধা। এখানে জঙ্গলটা একটু বেশি ঘন হওয়ার দরুন চারদিকটা একটু অন্ধকার মতো। আমরা তিনজন ঝর্ণার পাশে একটা বড়ো পাথরের উপর বসে ঝর্ণার অবিরাম জল পড়ার শব্দ শুনতে থাকলাম। যেন মনে হচ্ছে হিমালয়ের কোনও স্বল্প পরিচিত জায়গায় বসে আছি। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। এমন সময় ঝেপে বৃষ্টি নামল। কিন্তু আমরা সেভাবে ভিজলাম না। চারদিকে অসংখ্য ছোট-বড় গাছ। মাথার উপর যেন পাতার একটা ছাউনি তৈরি হয়েছে। তারপর বৃষ্টি কমতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চললাম বুরুডি লেকের দিকে। আগে থেকে দুপুরের খাবারের অর্ডার দেওয়াই ছিল। খেতে বসে গেলাম নির্ধারিত দোকানে। ধুমায়িত দেশি মুরগির ঝোলের সঙ্গে যখন গরম ভাত উদরস্থ করছি, এমন সময় আবার ঝেপে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জল যখন জলাধারে আছড়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে, সমস্ত জলাধারটির উপর কেউ যেন সাদা মশারি খাটিয়ে দিয়েছে। যা দেখলাম, হয়ত কোনওদিন ভুলতে পারব না। ঘন্টা দেড়েক সময় কাটিয়ে চললাম ফুলডুঙড়ি পাহাড়ের দিকে। মন চাইছিল আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় এই বুরুডি লেকের ধারে কাটাই। কিন্তু ফিরতে হবে নিজ নিকেতনে।

ফুলডুঙড়ি পাহাড়ের পরিবেশ দেখে বুরুডি, ধারাগিরি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা একরাশ ভালোলাগা, মুগ্ধতা কর্পূরের মতো উবে গেল। তড়িঘড়ি পাহাড় থেকে নেমে চললাম সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। একে একে চিত্রকুট পাহাড় আর রুক্মিনী মায়ের মন্দির দেখে হৃত ভালোলাগা, মুগ্ধতা পুনরুদ্ধার করে ক্লান্ত শরীরে এসে পৌঁছালাম ঘাটশিলা স্টেশনে । বারবিল জনশতাব্দী ট্রেন আসতে নির্ধারিত কামরায় সংরক্ষিত আসনে শরীরটা পিছনের দিকে এলিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল। কিন্তু কানে ভেসে আসতে লাগল অবিরাম পাথরের উপর পড়ে চলা জলের ক্ষীণ শব্দ।

লাল সেলাম লেপচা খা

বক্সা ফোর্টে কত না বলা কথা জমে আছে! একটু কষ্ট করে উঠে পড়ুন। বক্সা ছাপিয়ে পৌঁছে যান ছবির মতো সুন্দর এক পাহাড়ি গ্রাম। গরমে একটু অন্যরকম ঠিকানা খুঁজছেন! তাহলে একটু ঘাম ঝরিয়ে সেই গ্রামে পৌঁছে যান। ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন সৌম্যদীপ সরকার।

কখনও পাবেন পাথুরে রাস্তা। কোথাও আবার একটু সমতল মাটির রাস্তা। কোথাও গিয়ে দেখবেন পথ হারিয়ে গেছে গাছের ভিড়ে। শেকড় পেরিয়ে রাস্তা খুঁড়ে নিন। দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যান। ছোট ছোট ভুটানি বস্তি। একটু জিরিয়ে নিন। দুচোখ মেলে দেখুন নিসর্গকে। ব্যস, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে আপনি পৌঁছে গেলেন এক পাহাড়ি উপত্যকায়।

না, পাকা রাস্তা নেই। গাড়ি নিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। ওঠার পরেও বিলাসবহুল কটেজ বা রাস্তোরাঁ পাবেন, এমন আশা না করাই ভাল। তবে যা পাবেন, আপনার দু চোখ জুড়িয়ে যাবে। মনে হবে, এই লেপচা খা-তে আগে কেন আসিনি!

আমাদের সঙ্গে থাকা এক শিক্ষক। নাম জ্যোতির্ময় রায়। অনেকদিন ধরেই বলছিল, ডুয়ার্স যাব। কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরা ডুয়ার্সে তাকে কী দেখাব? একদিকে

পাহাড়ি নদী, একদিকে ঘন জঙ্গল। বইয়ে সেগুলোই পড়ে এসেছে। বন্ধুদের কাছে বহুচর্চিত কয়েকটা জায়গার নামই শুনে এসেছিল। মনে হল, একটু ব্যতিক্রমী জায়গায় নিয়ে গেলে কেমন হয়? তাকে বলেছিলাম লেপচা খা-র কথা। জ্যোতিদা বলল, সেখানে কী আছে? বললাম, পাহাড়ের ওপর গ্রাম। সে বলল, সমতলে এত এত গ্রাম থাকতে পাহাড়ি গ্রামে কেন থাকতে যাব? যখন শুনল, ওপর পর্যন্ত গাড়ি ওঠে না, তখন আরও গালমন্দ শুরু করল।

মনে মনে বললাম, হে প্রকৃতি, এ জানে না, এ কী বলছে। একে তুমি ক্ষমা করো। পথ কতটা দুর্গম, ইচ্ছে করেই বলিনি। যদি শুনত ওই পাহাড়ি পথের পুরোটাই হেঁটে উঠতে হবে, আমি নিশ্চিত, সে রণে ভঙ্গ দিত। আর সে রণে ভঙ্গ দিলে আমাদেরও যাওয়া হত না। এদিক-ওদিক জঙ্গল ভ্রমণ সেরে আমরা পাড়ি দিলাম সান্তালাবাড়ির দিকে। আলিপুরদুয়ার থেকে মোটামুটি এক ঘণ্টার পথ। আপনি যদি বক্সা পাহাড়ে যান, এই পথ দিয়েই যেতে হবে। আর গাড়ি যায় ওই সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত।

তারপর বাকি পথটা নিজের পায়ের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই।

তাহলে, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে উঠে পড়ি। কিন্তু কতদূর? ফিজিক্সের মাস্টারমশাইকে তো বলা যাবে না। একটা পবিত্র মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হল। এই তো একটু। যেতে যেতে বক্সা পড়বে। ওখানে একটু ঘুরে দেখব, একটু জিরিয়ে নেব। কিছু খেয়ে নেব। তারপর আরেকটু উঠলেই লেপচা খা। যত এগোই, বদলে যেতে থাকে দৃশ্যপট। কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও নিচে তাকালেই খাদ। কোথাও ছোট ছোট বনবস্তি। আবার একটু দূরে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। কোনটা কী নদী, সেটা জানার মতো কৌতূহল সেই সময় সেই মাস্টার মশাইয়ের ছিল না। তার তখন একটাই গান, কতদূর আর কতদূর। আমরা চোখ টেপাটেপি করে বলে চলেছিলাম, এই তো আর একটু। একটা সময় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তার বাক্যালঙ্কার অব্যয়ের তীব্রতা বেড়ে গেল। বাধ্য হয়ে কয়েকবার বিরতি নিতে হল। অবশ্য শুধু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরাও কিছুটা হাপিয়ে গিয়েছিলাম। যেখানেই দাঁড়াচ্ছি, শুনতে হচ্ছে, 'আর জায়গা পেলি না? এখানে তোর বিয়ে দেব। শ্বশুরবাড়ি আসতে তোর দম বেরিয়ে যাবে।' আবার কখনও বলছে, 'পাহাড়ে উঠতে দে, যদি ভাল না লাগে, তোকে ওখান থেকে ঠেলে ফেলে দেব। তারপর পাহাড়ের উপর তোর স্মরণসভা করব।' এ তো গেল সংসদীয় ভাষা। অসংসদীয় যা কিছু, তা উহ্য থাক।

এভাবেই আস্তে আস্তে পৌঁছে গেলাম বক্সায়। সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক। কখনও আমি, কখনও আমার সঙ্গে যাওয়া দুই দাদা শুভঙ্কর সরকার ও শীর্ষেন্দু সরকার জ্যোতিদাকে বোঝাতে লাগলাম বক্সা দুর্গের মাহাত্ম্য, এখানে কারা কারা বন্দী ছিলেন। স্মরণীয় সেসব ঘটনা। কিন্তু জ্যোতিদা শুনলে তো! পারলে আমাদেরই বক্সার জেলখানায় আটকে রাখে। খুব খিদে পেয়েছে, একটা দোকানে মিমি (অভিনেত্রী মিমি নয়, এটা ম্যাগির পার্বত্য সংস্করণ বলা যায়) খাওয়া হল। এতক্ষণে জ্যোতিদা একটু শান্ত। এবার পাড়ি দিলাম লেপচা খা-র দিকে। বক্সা থেকে ঠিক কতটা? দুটো ছোট্ট তথ্যে এই সময় একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। বক্সার উচ্চতা ২২০০ ফুট। আর লেপচা খা-র প্রায় তিন হাজার ফুট।

এর মধ্যে আমাদের পোর্টারের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। সঙ্গে ব্যাগপত্তর থাকলে সান্তালাবাড়ি থেকেই পোর্টার পেয়ে যাবেন। ঝুড়িতে করে সে সব ব্যাগ নিয়ে নেবে। কোথায় যেতে চান, তাকে শুধু বলে দিন। সে হনহন করে উঠে ঠিক রেখে দিয়ে চলে আসবে। সে যখন নেমে আসবে, তখন আপনি হয়ত অর্ধেক পথ উঠেছেন। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই হল। আমরা তখনও বক্সাতেও পৌঁছাইনি, আমাদের পোর্টার রঞ্জিত দেখলাম দিব্যি গান করতে করতে নেমে আসছে। সে আশ্বস্ত করল, কোনও চিন্তা নেই। আপনারা যান, দিদির ঘরে সব রেখে এসেছি। আপনারা আসছেন, সেটা বলেও এসেছি। কে এই দিদি? সে কথায় পরে আসছি।

বক্সা থেকে ফের রওনা দিলাম লেপচা খা-র দিকে। জ্যোতিদা ততক্ষণে আমাদের চালাকিটা বুঝে ফেলেছে। আমরা মুখে বলছি, এই তো সামনে, প্রায় চলেই এসেছি। ও মনে মনে ধরে নিয়েছে, এখনও অনেকটা দূর। তাই এবার সে শান্ত। যা কিছু বাক্যালঙ্কার অব্যয়, সব মনে মনে। আমরাও মুখ টিপে টিপে হাসছি। আসলে, ততক্ষণে জায়গাটা একটু একটু করে ভাল লাগতে শুরু করেছে। কারণ, পাহাড়ের ওপর থেকে নিচটা অসাধারণ লাগছিল। বক্সা থেকে আরও একঘণ্টা পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম লেপচা খায়ে।

ছোট্ট একটা গ্রাম। ছবির মতো সুন্দর। সবমিলিয়ে গোটা তিরিশেক বাড়ি। এখানে দিদি মানে মমতা ব্যানার্জি নয়। এখানে দিদি মানে ফুক দেন ডুকপা। আসলে, পর্যটকরা এলে এখানে দিদির বাড়িতেই ওঠেন। আরও দু একটা বাড়ি আছে। সবমিলিয়ে পঁচিশজনের থাকার ব্যবস্থা

হয়ে যাবে। একবার দিদির ঠিকানায় পৌঁছে গেলেই হল। আর আপনার কোনও চিন্তা নেই। যেতে যেতেই পেয়ে যাবেন গরম চা। চাইলে মোমোও তৈরি হয়ে যাবে নিমেশেই। আর কী কী খেতে চান, দিদিকে একটু জানিয়ে রাখুন। ঘরগুলো বেশ সুন্দর। দোহাই, হোটেলের আড়ম্বরের সঙ্গে তুলনা করবেন না। বরং দুটো দিন দিদির আন্তরিক আতিথেয়তা উপভোগ করুন।

পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আপনি। অনেক দূরে ভুটানের সারি সারি পাহাড়। নদী, জঙ্গল, মেঘ সব আপনার পায়ের তলায়। এমনকি সূর্যও। দিনের আলো থাকতে থাকতে চার পাশটা একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। পশ্চিমে পড়বে কালজানি। পূর্বে পাবেন রায়ডাক নদী। মনে হবে, সূর্য যেন সেই নদীর গর্ভে ঘুমোতে গেল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। মেঘ আর আকাশ তখন যেন মাখামাখি করছে। চোখ মেলে থাকুন দিগন্তে। আকাশ আর মাটি যেন পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে।

একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসছে। এত উঁচুতে বিদুৎ বলতে সোলার লাইট। জ্যোৎস্না রাতে নদীর আবছা ছবি ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু নিচের ওই গ্রামগুলো? টিমটিম করে জ্বলছে আলো। কোনওটা আঠাশ মাইল এলাকার। রাজাভাতখাওয়া কোনটা? চিনতে না পারলে জিজ্ঞেস করে নিন। জয়ন্তীর আলোটা একটু কম। ওই তো, ওটা গাঙ্গুটিয়া বস্তির আলো। আর মাথার উপর জোনাকির মতো হাজার তারার মিছিল।

কিন্তু জ্যোতিদা কোথায়? এই নির্জন পাহাড় থেকে রাতের অন্ধকারে ফেলে দেবে না তো? দেখলাম, এখান-ওখানে গিয়ে মোবাইলের টাওয়ার খুঁজছে। বললাম, একটা দিন না হয় নাই বা কথা বললে। আমাকে ধমকে বলল, ‘তুই একটা গাধা। এমন সুন্দর একটা জায়গা। এমন ফিলিংসের কথা লোককে জানাব না? তাহলে লোকে জানবে কী করে? তুই যদি না বলতিস, তাহলে কি আমি জানতাম?’ ফিরে গিয়ে বললেই তো পারো। আবার তেড়ে উঠল, ‘বিশ্বকাপ দেখতে রাত জাগিস কেন? লাইভ দেখবি বলেই তো। আমি লাইভ কমেন্ট্রি দিতে চাই। পরে বলার মধ্যে কোনও রোমাঞ্চ নেই। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, লাল সেলাম লেপচা খা।’

বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। দুর্গম পথে যে জ্যোতিদার কণ্ঠে বাক্যালঙ্কারের লাইভ কমেন্ট্রি শুনছিলাম, সেই জ্যোতিদার কণ্ঠে মুগ্ধতার কবিতা! লেপচা খা, সত্যিই তোমাকে সেলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একজন মানুষের এমন রূপান্তর ঘটে যায়!

বেঙ্গল টাইমস

শারদ সংখ্যা ২০২৩

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।

ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, ই-মেল bengaltimes.in@gmail.com

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী